182. Jc. 917.34

# দারুব্রহ্ম।

পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেডক্লার্ক ও একাউণ্ট্যাণ্ট

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বসু প্রণীত।

ও

প্রকাশিত।

Printed by B. B. Munshi at the Pooran Press
21, Boloram Ghosh Street Shambazar
(CALCUTTA)

সাল ১৩২৪।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

182. Jc. 917.34

# দারুব্রহ্ম।

পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেডক্লার্ক ও একাউন্ট্যাণ্ট

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বসু প্রণীত।

ও

প্রকাশিত।

Printed by B. B. Munshi at the Pooran Press
21, Boloram Ghosh Street Shambazar
(CALCUTTA)

সাল ১৩২৪।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

13. JAN. '9
...ARY

# বিজ্ঞাপন।

## শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু প্রণীত

## অমিয়া। (ধর্ম্মোপন্যাস।)

1917

এই পুস্তকে পুনর্জ্জন্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগ, দাম্পত্য প্রেম কিরূপে ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয়, কিরূপ সহজ উপায়ে সত্বর চিত্ত শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদর্শনলাভ হয় ইত্যাদি বিষয় অতিসরল এবং সহজ ভাষায় বুঝান হইয়াছে। মুল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কতিপয় সংবাদ পত্রের মতামত এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল :—

**আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা :—** "গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় জীবের মঙ্গলার্থ জন্মান্তরবাদ প্রমাণ পূর্ব্বক একটী অত্যুপাদেয় নিষ্কামধর্ম্মের উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সকলেই বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিবেন।"

**বঙ্গবাসী :—** "এই পুস্তকে যে কয়টী গার্হস্থচরিত্র চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা চিত্তাকর্ষক বটে, ফলে ধর্ম্মবাণী চরিত্রে এমনভাবে বিজড়িত হইয়াছে যে তাহাতে গ্রন্থখানিকে আজি কালিকার হিসাবে একটু নূতনধরণের বলা যাইতে পারে। ভাষার বাহ্যাড়ম্বর নাই, ভাষার গতিপদ্ধতি বক্র নহে, সরল সহজ ভাষায় চরিত্রের স্থচারু চিত্র। চরিত্রের চাতুর্য্যে যোগ, জপ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির অবতারণা এমন কৌশলময় যে তাহাতে ধর্ম্মাচার্য্যের কাযটা উপন্যাসে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া পাঠ বিরক্তিকর হয় নাই। বিশ্বাসের চক্ষু লইয়া এগ্রন্থ পড়িলে অনেকেরই চিত্তশুদ্ধি আসিতে

পারে। অনেকস্থলে শোচনীয় ঘটনায় চক্ষুর জল আকর্ষণ ক[illegible]বার দৈব প্রভাবোন্মাদনায় চিত্ত পুলকিত করিয়া তুলে। ঘাতপ্রতিঘাতে গ্রন্থের অনেক স্থানেই উপন্যাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে।"

**আর্য্যদর্পন** :— "একমাত্র পতিসেবাদ্বারা স্ত্রীজাতি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অমিয়ার উদাহরণ দ্বারাই তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উপন্যাসের ভাষায় ধর্ম্মের জটীল গূঢ়তত্বের সরল মীমাংসা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁহার চেষ্টা অভিনব বটে।"

**অমৃতবাজার** (বঙ্গানুবাদ) :— "দাম্পত্যপ্রেম কিরূপে বিশ্ব ও ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হইতে পারে ইহা গ্রন্থকার বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা সরল ও সহজ। অমিয়া আদর্শ হিন্দু-রমণী। এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর চরিত্র পাঠে আমাদিগের হিন্দুরমণী সকল বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন।"

**পুস্তক প্রাপ্তিস্থান** :— (১) গ্রন্থকারের নিকট। (২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

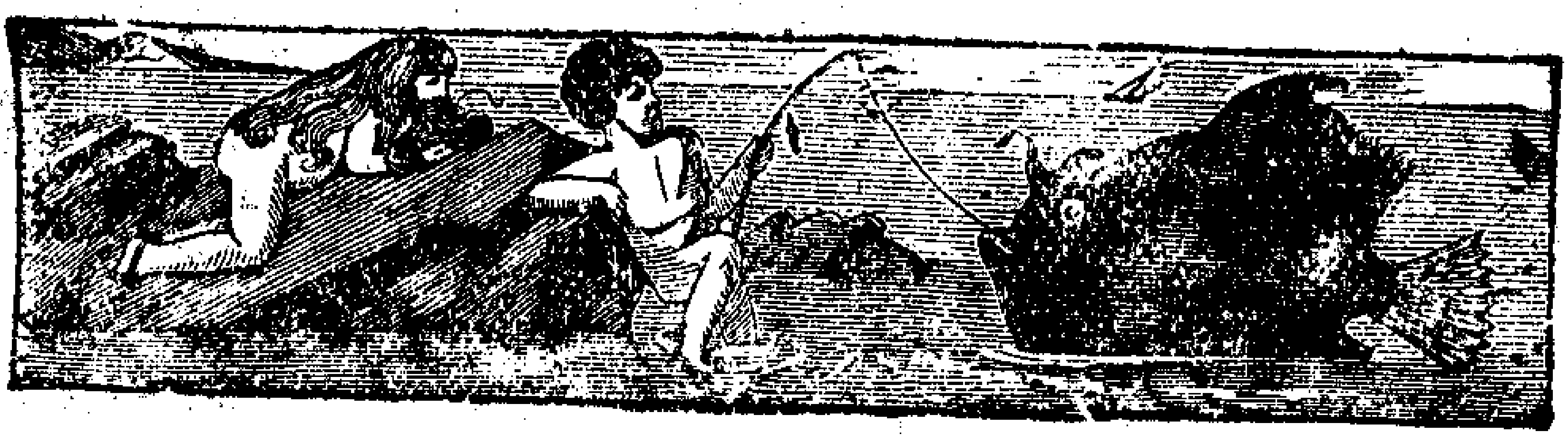

# দারুব্রহ্ম।

## উপক্রমণিকা।

নিত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ-গুণের সূক্ষ্মাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। সেই প্রকৃতি দুই প্রকার—মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নৈর্ম্মল্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া এবং মালিন্যপ্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে মায়া এবং রজস্তমঃ গুণযুক্ত সত্ত্বগুণকে অবিদ্যা বলে। সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আবির্ভূত হয় তাহা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাতে সৎএর প্রকাশ আছে—সত্ত্ব ও আছে, প্রকাশের প্রতিবন্ধক আছে—তমঃ ও আছে এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার চেষ্টা আছে—রজঃ ও আছে। মুকুলে পুষ্পের ভাব যেমন কতক অংশে প্রকাশ পাইতেছে তেমনি প্রকাশের প্রতিবন্ধক ও বর্ত্তমান আছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা ও বর্ত্তমান আছে। মুকুলে যদি প্রকাশের প্রতিবন্ধক না থাকিত তাহা হইলে মুকুল এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণবিকসিত হইয়া পুষ্প হইয়া উঠিত এবং যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত

মুকুলে পুষ্পেরভাব যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাই সত্ত্বগুণ, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই তমঃগুণ এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই রজঃগুণ। এই ত্রিগুণ জগতের সর্ব্ব পদার্থেই পরিব্যাপ্ত আছে। মূল প্রকৃতিতে জগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। প্রকৃতিতে এই তিনগুণ আছে বলিয়া জগতের প্রত্যেক পদার্থে এই তিন গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উপরি উক্ত মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনি সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন এবং উক্ত অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কথিত হন। সেই অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের তারতম্য বিশেষে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জীব ও অনেক প্রকার হয়। এই অবিদ্যার নাম কারণ শরীর। জীব অবিদ্যাধীন বলিয়াই কর্ত্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কর্ত্তৃত্বাভিমানকেই অহঙ্কার বলে। যতদিন এই অহঙ্কার না যাইবে ততদিন ভগবৎ প্রাপ্তির কোন আশা নাই। এই অহঙ্কার দূর করাই ঈশ্বরোপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য।

ভগবৎ প্রাপ্তির ত্রিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। ইহাদিগের মধ্যে কর্ম্মই প্রধান, কারণ জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মের ফল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক—আমি অন্ন ভোজন করিতেছি, অন্ন ভোজনটী কর্ম্ম, তজ্জনিত ক্ষুধা নিবৃত্তি ও আনন্দ তাহার আনুসঙ্গিক ফল। ক্ষুধা নিবৃত্তি ও আনন্দ অন্নভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই হইতেছে সুতরাং তাহারাও কর্ম্মসংজ্ঞার মধ্যে ভুক্ত।

প্রীতি ভক্তি উভয়ই বেদাধ্যয়নের আনুসঙ্গিক ফল। সুতরাং কর্ম্মই মূল—জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্ম বৃক্ষের ফল পুষ্প ভিন্ন আর কিছু নয়।

কর্ম্ম দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। কামনা করিয়া কর্ম্ম করাকে সকাম কর্ম্ম এবং কামনা না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। সকাম কর্ম্মের দ্বারা জীবের সংসারে যাতায়াত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কামনা না করিয়া সকল কর্ম্ম করেন তাঁহাদের ভোগের আবশ্যক হয় না এবং সংসারে ও আসিতে হয় না। সুতরাং প্রত্যেকেরই কামনা না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করা উচিত।

জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মের ফল মাত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উভয়ের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই জন্য মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন গান করিয়াছিলেন, "এবার কালী তোমায় খাব। আমি খাই কি তুমি খাও মা দুটার একটা করে যাব।" লোকে মনে করিয়াছিল, রামপ্রসাদ বোধ হয় পাগল হইয়াছে নতুবা কালীকে খেতে চায় কেন? ইহা যে বিকৃত মস্তিষ্কের কথা নয় তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রামপ্রসাদ বলিয়া ছিলেন, "এবার আমি ও তুমি পৃথক বস্তু রহিব না, হয় আমি থাকিব কিম্বা তুমি থাকিবে। তোমার অস্তিত্ব লোপ করিয়া আমিময় হইব কিম্বা আমার অস্তিত্ব লোপ করিয়া তুমিময় হইব।" আমিময় হইতে ইচ্ছা করিলে জ্ঞানমার্গে এবং তুমিময় হইতে ইচ্ছা করিলে ভক্তিমার্গে যাইতে হইবে।

জ্ঞানমার্গ দ্বারা অহঙ্কার দূর করা অতীব কঠিন, কারণ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা অহং জ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া সোঽহং জ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অহং জ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে হইবে। যাহা দ্বারা অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইবে তাহার দ্বারা অহঙ্কারের নিবৃত্তি করা কি সহজ? জ্ঞানমার্গ দ্বারা অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু বহুজন্ম সাপেক্ষ।

কলির জীবের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য, বল এবং আয়ু তিনেরই অভাব, সুতরাং জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করাই কর্ত্তব্য।

ভগবৎ প্রাপ্তির দ্বিতীয় পথ ভক্তিমার্গ। এই পথ অবলম্বন করিতে হইলে আপনাকে তুচ্ছ এবং হেয়জ্ঞান করিতে হইবে, তৃণ অপেক্ষা নীচ জ্ঞান করিতে হইবে, তাহা হইলে অতি সহজে এবং অল্প কালের মধ্যে অহংজ্ঞানকে পরাভূত করা যাইবে। এই জন্যই মহাত্মা নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "মন, চলরে ভক্তিমার্গে। জ্ঞানমার্গে গেলে কৃষ্ণ নাহি মিলে, যদি মিলে বহু ভাগ্যে।"

এতক্ষণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ইহাদের প্রত্যেকেই মুক্তিদান করিতে পারে কিন্তু কোনটীই সহজ সাধ্যনয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে তীর্থ দর্শনে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞান লাভ না হইলে হয় না। তাহা হইলে আমাদের মত পাপীর কি আর উপায় নাই? আছে। ভগবান দয়াময়, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান, তিনি আমাদের মত দুর্ব্বল জীবের ও মোক্ষলাভের এক উপায় করিয়াছেন। কতিপয় পুরাণ পাঠে জানা যায় যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবান নিত্যবিরাজ করিতেছেন। এখানে বাস করিলে এবং দারুব্রহ্ম দর্শন করিলে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

বেদব্যাস উবাচ—

দক্ষিণোদধিতীরস্থং দারু ব্রহ্মাবলোকিতম্।
বিনা সাংখ্যমতং পুংসাং দর্শনান্মুক্তিদং ধ্রুবম্॥
ইত্যয়ং দারুরূপীশো দর্শনাদপি মুক্তিদঃ।
কিং পুনস্তস্য চরণপ্রান্তে প্রাণান্ বিমুঞ্চতঃ॥

পদ্ম পুরাণে—

"ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যে স্বেচ্ছাশনংদেবী মহা হবিষ্যম্।
যোগোঽত্র নিদ্রা ক্রতবঃ প্রচারঃ স্তুতি প্রলাপঃ শয়নং প্রণামঃ।
পথি শ্মশানে গৃহমণ্ডপে বা রথ্যা প্রদেশে ভুবি যত্র তত্র।
ইচ্ছন্ননিচ্ছন্ পুরুষোত্তমাখ্যে দেহাবসানে লভতে চ মোক্ষম্॥"

গরুড় পুরাণে—

ব্রহ্মোবাচ—

"কৃমি কীটপতঙ্গাদ্যাস্তীর্য্যগ্‌যোনি গতাশ্চযে।
ততদেহং পরিত্যজ্য তেযান্তি পরমাং গতিং॥
স এষ করুণাসিন্ধুঃ সিন্ধোস্তীরে শরীরবান্।
যথা তথা দৃষ্টি পথাদাচণ্ডালাৎ বিমুক্তয়ে॥"

বিষ্ণু পুরাণে—

"ন কাল নিয়মো বিপ্রাব্রতে চান্দ্রায়ণে তথা।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভুঞ্জীয়াৎ যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ॥

উপরিউক্ত শ্লোক দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে দারুব্রহ্ম যিনি নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার দর্শনে মুক্তি, তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণে মুক্তি, তাঁহার ক্ষেত্রে বাস করিলে মুক্তি এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি। এখানে যাহা ইচ্ছা আহার কর মহা হবিষ্যের ফল হইবে, এখানে নিদ্রাতে যোগের ফল, এখানে আলাপ করিলে বেদাধ্যয়নের ফল, শয়ন করিলে জগন্নাথকে প্রণাম করিলে যে ফল হয় সেই ফল, এবং যে কোন ভাবে মৃত্যু হউক মুক্তি অবধারিত। এরূপ সহজে মুক্তিলাভ আর কোন তীর্থ দিতে পারেন না।

জগন্নাথ দেবই দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাংখ্য-

দারুব্রহ্ম দর্শন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সূর্য্যের স্বভাব যেমন তাপ দেওয়া চন্দ্রের স্বভাব যেরূপ শীতলতা প্রদান করা, সেইরূপ এই দারুময় মূর্ত্তির স্বভাব মোক্ষ প্রদান করা। সেই পরম কারুণিক অধমতারণ দারুব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এইক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সম্বন্ধে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের যে সমস্ত উৎসব এবং বেশ হয়, পুরীর প্রসিদ্ধ মঠ এবং স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ও অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের প্রণীত শ্রীজগন্নাথ মন্দির গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি।

পুরী।<br>
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল।

বিনীত—<br>
শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বসু।

# দারুব্রহ্ম।

## পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

সত্যযুগে রাজস্থানের অন্তর্গত মালবদেশে অবন্তী নামক নগরে সূর্য্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী ছিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী, দেবগুরু বৃহস্পতি সম বুদ্ধিমান, কুবেরের তুল্য ধনবান, সদাচারী, প্রজাবৎসল, মহাযোগী এবং অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি এক দিন পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ বেষ্টিত হইয়া বিষ্ণু আরাধনায় রতছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ জটিল ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুক্ষেত্র সমূহের বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। ভগবান জটিল অন্যান্য বিবরণের সহিত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের স্থূল বিবরণ যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এস্থলে লিখিত হইল। "উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর নিকট হইতে ঋষিকুল্যা পর্য্যন্ত স্থান অতি পবিত্র, তন্মধ্যে বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীরবর্ত্তী পঞ্চক্রোশ স্থানকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলে। এই পঞ্চক্রোশ স্থানের মধ্যে ক্রোশত্রয় পরিমিত স্থান দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খাকৃতি এবং অতীব দুর্গম। এই শঙ্খাকৃতি স্থানে নীলাদ্রি নামক পর্ব্বতে মাধব-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। নীলপর্ব্বতের নিকটে এক মহান বটবৃক্ষ আছে এবং তাহার পশ্চিমে শবরনামে এক দ্বীপ বিরাজ করিতেছে। এই

নীল মাধবকে অর্চ্চনা করেন এবং অপর ছয়মাস উক্ত ব্যাধ পূজা করিয়া থাকে। আমি নিরন্তর তথায় বাস করি। যদি তুমি এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে অগ্রে এক ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ কর, তিনি পথ নিরূপণ এবং নীল পর্ব্বত দর্শন করতঃ ফিরিয়া আসিলে পশ্চাৎ তুমি যাত্রা করিবে। মহারাজ! তুমি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, তোমার দ্বারাই এই পবিত্রক্ষেত্র প্রকাশিত হইবে।" জটিল ব্রাহ্মণ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। উপরিউক্ত জটিলের বাক্যদ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে পুরাকালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সমুদ্রগর্ভে শৈলদ্বীপ ছিল। তদনন্তর এই স্থানটী ত্রিকোণদ্বীপ আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই ত্রিকোণ দ্বীপে নীল পর্ব্বত ছিল এবং উহা তৎকালে শবরদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুভক্ত বিদ্যাপতিকে নীলাদ্রিগমনার্থ আদেশ করিলেন। বিদ্যাপতি রথারোহণে ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হইয়া শবরদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর শবরদ্বীপের ঈশ্বর বিশ্বাবসু ব্যাধের সহিত মিত্রতা স্থাপন করতঃ তাহার অনুগ্রহে মাধব দর্শন করিলেন এবং তাহার কুটীরে ফলাহার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময় বিশ্বাবসু সরলভাবে বিদ্যাপতিকে বলিলেন, "মিত্র! পুনরায় আসিলে এ মূর্ত্তি ও এই পর্ব্বত দেখিতে পাইবে না। এই ভূধর সত্বর বালুকা দ্বারা প্রোথিত হইবে এবং মাধব মূর্ত্তি এস্থান হইতে তিরোহিত হইবেন।"

বিদ্যাপতি স্বদেশে আসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় রাজার নিকট প্রকাশ করিলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন পরিবার, প্রজাবর্গ এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া, মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করতঃ অকস্মাৎ আগত মহর্ষি নারদের সহিত পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। অবন্তী রাজধানী ত্যাগ করিয়া

উক্ত স্থান মহানদীর তীরবর্ত্তী। এই স্থানে উড়িষ্যারাজের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তথা হইতে ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর অরণ্য ও পর্ব্বতময় প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় মহারাজের বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই দুর্লক্ষণ দেখিয়া তিনি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন! আমার বাম চক্ষু কেন স্পন্দিত হইতেছে, শীঘ্র বলুন।" তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন, "মহারাজ! নীলপর্ব্বত প্রবল ঝটিকা কর্ত্তৃক বালুকা দ্বারা আবৃত হইয়াছে এবং ভগবান নীলমাধব এস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর শোকে, দুঃখে এবং আশাভঙ্গে অত্যন্ত কাতর হইয়া পাত্র, মিত্র প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং তথায় যাইয়া আমার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার আদেশ অনুসারে রাজ্য সংক্রান্ত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে থাক। আমি এদেহ আর রাখিবনা, এখনই সমুদ্র কিম্বা অনলে প্রবেশ করিয়া এপাপ জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

তখন দেবর্ষি নারদ রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! তুমি পরম জ্ঞানী হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিতেছ কেন? যে দিন ভগবান নীলমাধব দারুময় মূর্ত্তিধারণ করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছেন সেই দিনই আমি পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার প্রতি ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন—তোমার আর ভাগ্যের সীমা নাই। তুমি এই পবিত্রক্ষেত্রে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাহা হইলে তাঁহার দর্শন পাইবে। তিনি তোমা কর্ত্তৃক দারুব্রহ্মরূপে স্থাপিত হইয়া জগতের জীব সকলকে দর্শনদানে চরিতার্থ করিবেন। জীব সকল সেই

মহারাজ! তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? অতএব শোক পরিত্যাগ করতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।”

এই সময় সহসা দৈববাণী হইল, “মহারাজ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। দেবর্ষি নারদের আদেশমত কার্য্যকর তাহা হইলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। আমি দারুকলেবর ধারণ করতঃ তোমা কর্ত্তৃক এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরদিন জীবগণের নয়ন চরিতার্থ করতঃ তোমায় অমর করিয়া রাখিব।”

মহারাজ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তাহারপর নারদের আদেশ মত তিনি নীলকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া তন্নিকটস্থ নৃসিংহ দেবের সমীপে আবাস গৃহ এবং বর্ত্তমানে যে স্থানে গুণ্ডিচাগৃহ, সেইস্থানে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞের হোম সাধনার্থ এত গো সংগ্রহ হইয়াছিল যে তাহাদিগের খুরাঘাতে এবং দানজলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর উৎপন্ন হয়।

যজ্ঞ সমাপনের দিবস শেষরাত্রে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্ন দেখিলেন যে ক্ষীর সমুদ্র মধ্যস্থিত শ্বেতদ্বীপে এক কল্পবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে এবং তাহার মূল প্রদেশস্থ সুবর্ণময় মণ্ডপের মধ্যে এক রত্ন সিংহাসন রহিয়াছে, তদুপরি নীল নীরদকান্তি পিতাম্বরধারী বনমালা বিভূষিত স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীদেবী (সুভদ্রা) এবং তদ্দক্ষিণে নীলাম্বরধারী বলরাম রহিয়াছেন। বিষ্ণুর বামভাগে সুদর্শনচক্র অবস্থিতি করিতেছে। মহারাজ স্বপ্নে ভগবানকে এইরূপ দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে নিদ্রাত্যাগ করতঃ দেবর্ষি নারদের নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। নারদ স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভগবান এইরূপে এইস্থানে আবির্ভূত হইবেন। তুমি আগামী কল্য সাগরতীরে দারুরূপী

তৎপর দিবস প্রাতঃকালে সমুদ্রস্নান করিবার সময় মহারাজ বিশ্বেশ্বরের নিকট সমুদ্রতীরে শঙ্খ চক্রাঙ্কিত এক বৃহৎবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি মহাসমারোহে সেই দারুকে আনয়ন করিয়া যজ্ঞবেদী মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং দারু দ্বারা ভগবানের কিরূপ প্রতিমা নির্ম্মিত হইবে তাহা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, "ভগবানের কি ইচ্ছা তাহা কাহার ও বলিবার শক্তি নাই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই প্রতিমা নির্ম্মিত হইবে। মহারাজ! তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় আকাশবাণী হইল, "মহারাজ! চিন্তিত হইও না। আগামীকল্য একজন বৃদ্ধ সূত্রধর এই স্থানে উপস্থিত হইবে, সেই ব্যক্তি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। তুমি পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত প্রতিমা স্থান অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর চারিদ্বার রুদ্ধ রাখিবে এবং সর্ব্বদা বাদ্যধ্বনি করিবে, যেন কোনরূপে সেই নির্ম্মাণ শব্দ কেহ শুনিতে না পায়, কারণ যে নির্ম্মাণ শব্দ শ্রবণ করিবে সে বধিরাদি দোষ গ্রস্ত হইবে। পঞ্চদশ দিবস পরে দ্বারউদ্‌ঘাটন করিয়া যেরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে তাহাই ভগবানের ইচ্ছারূপ মূর্ত্তি জানিবে।"

তৎপর দিবস মহোৎসব সময়ে একজন বৃদ্ধ সূত্রধর ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং যজ্ঞবেদীর চারিদ্বার রুদ্ধ করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বাজাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ষোড়শ দিবসে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এবং সুদর্শন এই চারিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে কিন্তু সূত্রধর নাই।

দেবর্ষি নারদ বলিলেন, "মহারাজ! অদ্য আমরা ধন্য হইলাম, জীবগণ ধন্য হইল কারণ সকলেই তোমাকর্ত্তৃক স্থাপিত এই মূর্ত্তি সকল

দর্শন করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবে। হে রাজন! বারাণসী এবং কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবন বাস করিলে যে ফল হয় এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ধর্ম্মকর্ম্ম না করিয়া ও যদি একদিন বাস করে তাহা হইলে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। বারাণসীতে যোগযুক্ত হইয়া মৃত্যু হইলে যে ফল হয় এই স্থানে অর্দ্ধঘণ্টাকাল বাস করিয়া মৃত্যু হইলে সেই ফল প্রাপ্তি হইবে।”

“বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবম্ বসেন্নরঃ।
প্রাপ্নোতি যৎফলং রাজন্‌ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
দিনমেকং বসেৎযস্তু সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে যদি॥
যা গতি র্যোগযুক্তস্য বারাণস্যাং মৃতস্য চ।
সা গতি র্ঘটিকার্দ্ধেন পুরুষোত্তম দক্ষিণে॥”

তদনন্তর রাজা বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া মন্দির নির্ম্মাণের ভার দিলেন। অষ্টাদশ দ্বীপ হইতে পাথুরিয়া আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। মহারাজ কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া অক্ষয়বটের বায়ুকোণে নীলাচলে যে স্থানে নীলমাধব ছিলেন সেই স্থানে সহস্র হস্ত পরিমাণ উচ্চ এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এই মন্দির পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু কালক্রমে বালুকাবৃত হওয়াতে পর্ব্বতের বিশেষ কোন চিহ্ন অধুনা এস্থানে দৃষ্ট হয় না। তাহার পর বহুতর দেবদেবী মূর্ত্তি খোদিত হইল এবং সেই সকল মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অনেক মন্দির নির্ম্মিত হইল। শ্রীমন্দিরের অগ্নিকোণে কল্পবট, তন্মূলে গণেশ ও মঙ্গলাদেবী, ইহাদের পশ্চিমে রোহিণী কুণ্ড, তৎপশ্চিমে বিমলাদেবী, তাঁহার উত্তরে সরস্বতী এবং তদুত্তর ভাগে

কপালমোচন, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়, অষ্টচণ্ডী প্রভৃতির মন্দির, স্নানমণ্ডপ, বৈকুণ্ঠ ও পাকশালা প্রভৃতি গঠিত হইল।

উপরিউক্ত মন্দির ও প্রতিমাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নারদের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় মণিকোদর নামক দৌবারিক মুনিকে বলিল, "পিতা এখন সামবেদ দ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতেছেন। আপনি তথায় গমন করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পরে রাজাকে লইয়া যাইবেন।" তখন নারদ দ্বারবানের কথামত ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া রাজার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে মালবাধিপতি, তুমি যে জন্য আসিয়াছ তাহা পূর্ব্বেই আমি জানি। তুমি যে সময়টুকু আমার নিকট অপেক্ষা করিলে তাহার মধ্যে এক মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। তোমার পুত্র পৌত্রাদি অনেক পুরুষ ধ্বংস হইয়াছে। ভূলোকে অনেক রাজা হইয়া গিয়াছেন। তোমার নির্ম্মিত প্রাসাদ ও প্রতিমা সকল বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসু বংশীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত। তুমি পুরুষোত্তমে যাইয়া প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর। এই শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি লইয়া যাও। আমি দেবতাদিগের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিব। মহারাজ! তুমি ধন্য, ভগবানের দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাদ্বারা তুমি কৃতার্থ হইবে। এরূপ দয়া ভগবান কাহাকে ও আর কোন কালে করেন নাই।" তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

রাজা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া দেখিলেন যে স্বকৃত মন্দিরে মাধবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার লোকের নিকট শুনিলেন যে মন্দির বালুকা দ্বারা প্রোথিত হইয়া যায় এবং রাজা গালমাধব ইহা পুনরুদ্ধার করিয়া মাধবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তখন মহারাজ মন্দিরের পশ্চিমে

মাধবজিউকে রাখিয়া তাঁহার সেবায় সেবক নিযুক্ত করিলেন। গালবরাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করেন কিন্তু দেবর্ষি নারদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লজ্জিত হইলেন এবং মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত দারু-ব্রহ্ম মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর নন্দীঘোষ, তালধ্বজ ও পদ্মধ্বজ নামে তিন খানি রথ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি প্রতিমাদিগকে স্থাপন করতঃ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। এই দিন হইতে এই উৎসব রথযাত্রা বা গুণ্ডিচা যাত্রা নামে খ্যাত হইয়াছে।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠোপযোগী সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিলে ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে দেবগণ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যে স্থানে প্রথম অবতরণ করেন তাহার নাম স্বর্গদ্বার। তাহার পর ব্রহ্মা বৈদিক মন্ত্রদ্বারা স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া নৃসিংহমন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবামাত্র নারায়ণ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার গাত্রতেজে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা করজোড়ে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। নৃসিংহদেব রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই জ্যোতিঃ মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ ভগবান ও ব্রহ্মাকে নানা স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান রাজার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ভগবদ্ বাক্যং—

“প্রাসাদভঙ্গে তৎস্থানং ন ত্যজামি কদাচন।
অনেন দারু বপুষা স্থাস্যাম্যত্র পরার্দ্ধকং॥”

ব্রহ্মপুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্নং রাজানং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—

“সর্ব্বঃ সম্পৎস্যতে কামস্তব রাজন্ যথেচ্ছসি।
মুক্তিপ্রদং মমক্ষেত্রং ত্রৈলোক্য সার-সংগ্রহং॥

ইদং ক্ষেত্রবরং রম্যং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদং।
ক্ষেত্রাণাং সর্ব্বতীর্থানাং রাজেব ক্ষেত্রমদ্ভূতং॥
যথা সমুদ্রস্তীর্থানাং রাজেন্দ্র উচ্যতে বুধৈঃ!
অতত্রব পুরাণাদৌ প্রধানত্বাচ্চ উচ্যতে॥
কলৌতীর্থানি ন সন্তি ক্ষেত্র ভাগীরথীং বিনা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা ক্ষেত্রাণাং পুরুষোত্তমঃ॥"

তাহার পর জগন্নাথের পূজা কিরূপে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে রাজাকে উপদেশ দিয়া ভগবান বৈকুণ্ঠে এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

কতকদিন রাজা জগন্নাথদেবের সেবা করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণগানে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মহারাজের মনোবাসনা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হইলে বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতিবংশীয়দের উপর সেবার ভার এবং গালব রাজার উপর তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। অদ্যাবধি বিশ্বাবসুবংশীয় দয়িত এবং বিদ্যাপতিবংশীয়েরা ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

উপরিউক্ত পৌরাণিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দুই একটী বিষয়ে পাঠক বর্গের মনে সন্দেহ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া আমরা এস্থলে তাহার আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমতঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সুতরাং সে সময় কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কেবল নরদেহধারী কৃষ্ণবলরামের নাম নহে, কৃষ্ণাবতারের পূর্ব্বে ও ইহা ভগবানের নমান্তর মাত্র ছিল। জগন্নাথ প্রভৃতি মূর্ত্তি সকলের গঠন প্রণালী দেখিলে ও

কৃষ্ণাবতারের বহুপূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কাহার অবলম্বনে মূর্ত্তিত্রয় গঠন করিয়াছিলেন? ওঁকার ব্রহ্ম। ভাষ্যকর্ত্তারা উঁহাকে অকার—উকার—মকার যোগ দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মা—বিষ্ণু—শিবাত্মক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই ওঁকার কে যন্ত্ররূপে নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুরা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ইহাও বর্ত্তমানে দেখা যায়। ওঁকার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এই ত্রিমূর্ত্তির দ্বারা ব্রহ্মের সৎচিৎ ও আনন্দ স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ জগন্নাথ সৎস্বরূপ, বলরাম চিৎস্বরূপ এবং সুভদ্রা আনন্দ স্বরূপ। সুতরাং প্রতিমা যে বেদানুমোদিত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ পূর্ণাবতার সেই হেতু কৃষ্ণাবতারের পর দারুত্রয়ের নাম কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই মুর্ত্তিত্রয়ের বাহিরে যে সুন্দর আকৃতি দেখা যায় তাহা পশ্চাৎ কল্পিত, তন্মধ্যে যে দারুময় মূর্ত্তি আছেন তিনি এবম্প্রকার নহেন—কেবল কর চরণ বিহীন দারুমাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম নামরূপাদি বর্জ্জিত বলিয়াই মূর্ত্তিত্রয় করচরণ বিহীন ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন মনুষ্য দেহে যে ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে কিন্তু এরূপ কার্য্য ইন্দ্রদ্যুম্নের ন্যায় মহাযোগী এবং মহাপুরুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। যোগী যোগবলে যে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই সকল ক্ষমতার নাম অষ্ট মহাশক্তি (১)—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব

(১) যে বিভূতি বলে প্রস্তর মধ্যে ও প্রবিষ্ট হওয়া যায় তাহাকে অনিমা বলে। যে শক্তিদ্বারা সূর্য্যমরিচি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যাইতে পারা যায় তাহাকে

এবং কামাবসায়িতা। যিনি এই অষ্ট মহাশক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় এই তিন শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের অপর সমস্ত শক্তিই লাভ করিয়া থাকেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবৎ আরাধনার দ্বারা অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মত ঈশ্বর-তুল্য লোকের পক্ষে ব্রহ্মলোকে গমন অসম্ভব কার্য্য নহে।

# ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

——:*:——

শ্রীমন্দির প্রথমতঃ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপন করেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির মৃত্যু হওয়াতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবাপূজাদি কার্য্য গালবাধিপতির হস্তে ন্যস্ত হয় তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। "মাদলা পঞ্জিকা" ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য উড়িষ্যার ইতিহাস নাই, সুতরাং এই পঞ্জিকাতে জগন্নাথদেবের মন্দির এবং উড়িষ্যার নরপতিদিগের ইতিবৃত্ত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা এস্থলে সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল।

মাদলা পঞ্জিকা লম্বাকারে তালপত্রে লেখা হইয়া মর্দ্দলাকারে বদ্ধ থাকায় ইহার নাম "মাদলা পঞ্জিকা" হইয়াছে। মন্দিরকে লইয়াই "মাদলা পঞ্জিকার" সৃষ্টি। এই পঞ্জিকা মন্দিরের সমকালীন। ইহার রীতি এই-

---

প্রাপ্তি বলে। যে শক্তিদ্বারা সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করা যায় তাহাকে প্রাকাম্য বলে। যে শক্তিদ্বারা এত বৃহৎ হওয়া যায় যে নক্ষত্রপুঞ্জ মস্তকে স্পৃষ্ট হয় তাহাকে মহিমা বলে। সমুদায় ভূতের উপর আধিপত্য করাকে ঈশিত্ব বলে। সকল প্রাণীকে বশীভূত করাকে বশিত্ব বলে। সমস্ত কামনাকে ইচ্ছানুসারে পূর্ণ বা নিবৃত্তি করাকে কামাবসায়িতা বলে।

রূপ প্রচলিত আছে যে যিনি যে সময় রাজত্ব করিবেন তিনি সেই সময় এই মাদলা পঞ্জিকা প্রথম হইতে লিখিবেন। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজ যযাতি উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা ছিলেন। ইনি অত্যন্ত বিক্রমশালী সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সময় হইতে মাদলা পঞ্জিকা শৃঙ্খলভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার পূর্ব্বের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না।

মাদলা পঞ্জিকার লেখা হইতে বোধ হয় যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্তৃক মন্দির ভূমিসাৎ হইলে খ্রীষ্টিয় পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে সশোকদেব নামধেয় একজন হিন্দুরাজা সেই স্থানে ৪৫ হস্ত পরিমিত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের পর হইতে সশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় মধ্যে যে কোন রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এরূপ কোন কথা মাদলা পঞ্জিকাতে উল্লেখ নাই। সুতরাং সশোকদেবের পূর্ব্বে কোন রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই। সশোকের পর ভোজ, বীর বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, অশোক প্রভৃতি অনেক রাজার অধীনে মন্দির ছিল।

৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যবংশীয় চন্দ্রবাহু রাজার রাজত্বকালে দিল্লি হইতে রক্তবাহু নামে এক যবনরাজ পুরী অভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকেরা রাজাজ্ঞায় সোনপুরে, পৃথ্বীগর্ভে প্রস্তরের একটী সামান্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জগন্নাথাদি বিগ্রহ রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত করিলেন এবং সেই স্থানে চিহ্নস্বরূপ একটী বটবৃক্ষ রোপণ করিলেন। সেই দিন হইতে সন্ধ্যাকালে সেই বৃক্ষমূলে তথাকার লোক সকলে দীপদান করিতে লাগিল। রক্তবাহু বংশীয়েরা ১০০ একশত বৎসরের অধিক সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জগন্নাথ

৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশরীবংশীয় রাজা জন্মেজয়ের পুত্র যযাতি কেশরী রক্তবাহু বংশীয় রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা স্বাধীন করেন। তিনি শৈব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি উপরিউক্ত বটবৃক্ষ নিম্নস্থ মূর্ত্তিত্রয় উদ্ধার করিয়া মহাসমারোহে পুরীতে আনিলেন। তাহারপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে বনযাগ বিধিদ্বারা অরণ্য হইতে দারু আনাইলেন এবং প্রাচীন মূর্ত্তির সাদৃশ্যে মূর্ত্তিত্রয় নির্ম্মাণ করিয়া নবনির্ম্মিত মূর্ত্তিত্রয়কে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বস্থানে ৩৪ হস্ত পরিমিত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পূর্ব্বস্থিত রত্নসিংহাসনে মূর্ত্তিত্রয়কে স্থাপন করিলেন এবং পূর্ব্বনিয়মানুসারে সেবাকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল।

এই মহারাজের সময়ে ভুবনেশ্বর অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, হইবারই কথা কারণ এই নৃপতি শৈব ছিলেন। এই রাজার সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সেই জন্য ইনি কান্যকুব্জ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহারপর কেশরীবংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি ললাটেন্দুকেশরী ৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীভুবনেশ্বর দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া মাদলা পঞ্জিকায় উক্ত আছে। মন্দিরে সংস্কৃত পদ্যে যাহা লিখিত আছে তাহা এস্থলে পাঠক বর্গের অবগতির জন্য লিখিত হইল। যথা :—

"গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস ললাটেন্দুকেশরী॥"

এই কেশরী বংশীয় রাজগণ ৪৪ পুরুষ ব্যাপিয়া ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজাদের মধ্যে যযাতি কেশরী ললাটেন্দুকেশরী এবং [illegible] বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রকেশরীর সময়ে নরেন্দ্র সরোবর খনিত হইয়াছিল। কেশরী বংশীয় রাজারা আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেন।

গোকর্ণেশ্বরের ঔরসে এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে চৌরগঙ্গ নামক একজন প্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কেশরী বংশের রাজাকে পরাস্ত করতঃ ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন। এই বংশীয় রাজাদের শাসন সময়ে রাজ্যের এবং মন্দিরের বহু উন্নতি সাধন হইয়াছিল। চৌরগঙ্গ বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করেন।

গঙ্গাবংশের ষষ্ঠনৃপতি অনঙ্গভীমদেব প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। এই মহারাজের সময়ে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরমহংস বাজপেয়ীর হস্তে মন্দিরের তত্ত্বাবধান এবং নির্ম্মাণভার অর্পিত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগস্থ প্রস্তরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্র-নায়কে। প্রাসাদঃ কারিতোহনঙ্গভীমদেবেন ধীমতা।" এই রাজা অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই উড়িষ্যার রাজা, আমি তাঁহার দাসমাত্র।" কৃষ্ণানদী হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

গঙ্গা বংশীয় সপ্তম রাজা লাঙ্গুলা নরসিংহ দেবের সময় কোণার্কের মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী অতীব সুন্দর, ইহা দেখিলে উড়িষ্যাবাসীরা শিল্পনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন একথা বলা যায় না। তৎপর এই বংশীয় দ্বাদশ পুরুষ নিঃশঙ্কভানু বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় বালধূপের প্রচার হয়। ইহার পরবর্ত্তী উনবিংশ সংখ্যক রাজা কপিলেন্দ্র দেব মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে মন্দিরের বহির্বেষ্টন নির্ম্মিত হইয়াছে। নিজের প্রধান মহিষীর অশেষ গুণ সম্পন্ন অষ্টাদশ পুত্র থাকা

দেবের স্বপ্নাদেশে কপিল দাসীপুত্র পুরুষোত্তম দেবকে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই কারণে কপিলেন্দ্রদেবের অষ্টাদশ পুত্রের সহিত পুরুষোত্তমদেবের নানা বিবাদ উপস্থিত হয় কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপাতে তাঁহারা পুরুষোত্তমদেবের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। পুরুষোত্তমদেব অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত এবং বিদ্বান ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র মন্থন করিয়া "মুক্তিচিন্তামণি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন এবং স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ না করিয়া অনঙ্গভীমদেবের ন্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে উড়িষ্যার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে মন্দিরের ভিতরকার প্রাচীর নির্ম্মিত হয়।

রাজা পুরুষোত্তমদেব কোন সময়ে কাঞ্চীনগরের রাজাকে জয় করিবার জন্য যাত্রা করেন। এই মহাত্মার ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলভদ্রদেব উৎকল রাজার পক্ষে যথাক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের তুরঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া যাত্রা করেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে সৈনিকবেশে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হন কিন্তু রাজা এই ঘটনার কিছুই জানিতেন না। ভগবানের কৃপায় কর্ণাটপ্রদেশ জয় করা হইল এবং কাঞ্চীনগরের রাজা পরাজিত হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলরামদেব মাণিক্যনাম্নী এক গোয়ালিনীর নিকট হইতে জগন্নাথ দেবের হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক বন্ধক দিয়া দধিক্রয় করেন এবং গোয়ালিনীকে বলেন যে পশ্চাতে যে রাজা আসিতেছেন তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গুরী ফেরত দিয়া দধির মূল্য লইবে। উভয়ে প্রস্থান করিলে রাজা তথায় আসিয়া গোয়ালিনীর নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি "নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া আত্মহারা হইলেন এবং গোয়ালিনীকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

সেই দিন হইতে ঐ গোয়ালিনীর নামানুসারে উক্ত গ্রামের নাম মাণিক্য পট্টনা হইয়াছে এবং এই নাম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। মন্দির মধ্যে ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও বলরামের যোদ্ধৃবেশের মূর্ত্তি ও দধিভাণ্ডবাহিনী গোয়ালিনীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

তাহারপর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বগুণধর, প্রজারঞ্জন, বীর পুরুষ, সুপণ্ডিত এবং পরমভক্ত প্রতাপরুদ্রদেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিক সমূহ হইতে মুসলমানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল। মহারাজ যখন দক্ষিণ দিকে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন সেই সময় বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান আসিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করে। রাজার অনুপস্থিতি হেতু সেবকগণ ভীত হইয়া জগন্নাথ প্রভৃতি মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে চিল্কাহ্রদ মধ্যস্থ চড়েইগুহা নামধেয় পর্ব্বত কন্দরে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহারপর রাজা উপস্থিত হইয়া মুসলমান দিগকে পারস্থ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিগুলি আনয়ন করিয়া রত্নসিংহাসনোপরি স্থাপন করা হইল।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। চৈতন্যদেবের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র যাজপুর নিবাসী ছিলেন। তিনি কোন কারণে উৎকল রাজের বিরাগ ভাজন হওয়াতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে বাস করেন। তাঁহার পুত্র জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। এই স্থানে চৈতন্যের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে অতিশয় উদ্ধত ছিলেন। যৌবনে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সুমধুর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। জীব উদ্ধারই চৈতন্যদেবের ব্রত। জগন্নাথের মহিমাবিস্তার, করিবার জন্যই তিনি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত

সকলেই চৈতন্যের দলভুক্ত হইলেন। সকলেই গৌর ভক্ত হইলেন এবং মহাপ্রভু ঘরে ঘরে পূজিত হইতে লাগিলেন। উড়িষ্যায় এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। পুরীতে স্থানে স্থানে মঠ স্থাপিত হইল। এই আনন্দ স্রোত অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া হইল, পরে এই স্থানেই চৈতন্যদেবের তিরোভাব হইল। রায় রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্র শোকে অধীর হইলেন এবং স্বরূপ ও দামোদর প্রাণত্যাগ করিলেন। যেমন আনন্দ সেইরূপ নিরানন্দ হইল।

শ্রীমন্দির গঙ্গাবংশীয় রাজগণের অধীনে ৪০২ বৎসর ছিল। মহাত্মা প্রতাপরুদ্রের সময় হইতে গঙ্গাবংশীয় সৌভাগ্য রবি অস্তাচলগামী হইল। তাঁহার দুই পুত্র এক এক বর্ষ রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় এই রাজবংশ বিলুপ্ত হইল।

গঙ্গাবংশ ধ্বংশের পরে "ভোইপুল" ও তৎকালীন মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন। তাঁহার অধীনে উড়িষ্যা আট বৎসর ছিল। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ভোই বংশীয়দিগের অধীনে মন্দির ছিল। তৎপর তেলেঙ্গা মুকুন্দ হরিচন্দনকে প্রজারা রাজা করেন। তিনি সুচারুরূপে প্রজাপালন ও দেশ শাসন করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গা স্নানের সুবিধার জন্য ত্রিবেনীর নিকট এক প্রস্তরময় ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ইঁহার সময়ে বঙ্গ শাসনকর্ত্তা সুলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করিবার জন্য কালাপাহাড়কে প্রেরণ করিলেন। কালাপাহাড় ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মুকুন্দ দেবকে বিনাশ করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করে।

কালাপাহাড়ের ভয়ে জগন্নাথ প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি পারিকুদ দুর্গভূমিতে প্রোথিত করা হয়। কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া মূর্ত্তিত্রয়কে ভূমি হইতে উঠাইয়া এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। উড়িষ্যাবাসী বিশার

কুজঙ্গ রাজার নিকট প্রদান করেন। তিনি নাভিস্থ ব্রহ্মমণি নূতন মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কতক দিন রাজত্ব করেন। এই বংশ শেষ হইলে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রজারা জনার্দ্দন বিদ্যাধরের পুত্র রাম চন্দ্র দেবকে উড়িষ্যার রাজা করেন। মোগলসম্রাট আকবরের হিন্দু সেনাপতি টোড়রমল্ল এবং মানসিংহ এই রাজার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। গঞ্জাম ইহার রাজত্বের অধীন করিয়া দিলেন। রাজা রামচন্দ্রদেব কুজঙ্গ হইতে অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথ দেবের নাভিমূল আনিয়া পুনর্ব্বার প্রতিমূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক তন্মধ্যে উক্ত মূর্ত্তির নাভি নিহিত করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দিরে স্থাপন করিলেন।

এই মন্দির ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই সময় শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী সেবা পরিত্যক্ত হইয়া বৈষ্ণব মতে সেবা আরম্ভ হয় এবং এখন পর্য্যন্ত সেইরূপ সেবা চলিতেছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। তাঁহারা পুরীতে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও মন্দিরের সেবকদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। ইংরাজদিগের মহৎগুণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ ও সেবক সকল স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহা দিগের হস্তে মন্দিরের ভার অর্পণ করিলেন। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার হিন্দু সিপাহীদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া ইংরাজেরা কটকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছু দিন কালেক্টর সাহেবের হস্তে মন্দির পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল। তদনন্তর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে খুর্দ্দারাজ মন্দিরের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ২,৩৩৩৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে

বর্ত্তমানে ও সেই খুর্দ্দারাজের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমান রাজা মুকুন্দদেবই মন্দিরের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। এখন ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বন্দোবস্ত হইতেছে। সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীমান্ গৌরশ্যাম মহান্তি মহোদয়ের দ্বারা বর্ত্তমানে মন্দিরের কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে।

---

# শ্রীমন্দিরের বিবরণ।

—:*:—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান মন্দিরের চারিটী দ্বার—পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, উত্তরদিকে হস্তিদ্বার, পশ্চিমদিকে ব্যাঘ্রদ্বার এবং দক্ষিণদিকে অশ্বদ্বার। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরকে মেঘনাদ প্রাচীর বলে। এই প্রাচীর ২৪ ফিট উচ্চ, উত্তর-দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট দীর্ঘ। সিংহদ্বারে দ্বাবিংশতি হস্ত উচ্চ একটী অরুণস্তম্ভ আছে, ইহা একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া ডানধারে পতিত পাবন মূর্ত্তি আছে। এই দ্বারটী পার হইলে বামদিকে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ৺কাশীর বিশ্বেশ্বর মহাদেব আছেন। ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া আর একটী দ্বার পাওয়া যায়, এই দ্বারে মিষ্টপ্রসাদ বিক্রয় হয়। এই দ্বারের নিকটে উত্তর ও পূর্ব্ব কোণে আনন্দ বাজার। আনন্দ বাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয় এবং তন্নিকটে স্নানবেদী এবং চাহিনী মণ্ডপ আছে। এই দ্বিতীয় দ্বারের পূর্ব্ব—দক্ষিণ কোণে রন্ধনশালা,

দ্বারে প্রবেশ করিয়া ডানধারে শীতলাদেবী, তাহার নিকটে সোণাকূপ এবং তাহার দক্ষিণে বৈকুণ্ঠ ধাম আছে। বামদিকে লোকনাথ মহাদেব ও ঈশানেশ্বর শিবমন্দির আছে। পশ্চিমদিকে ব্যাঘ্রদ্বার। এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া বামদিকে হনুমান, শিবমন্দির ও ধান্য কুটীর। ডানদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর। ইহার নিকটেই একটী দ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া তুলসী ও ফুলবাগানে যাইতে হয়। ফুলবাগানের ভিতর এক খানি গৃহ আছে, তথায় ফুল সংগ্রহ এবং মালা গাঁথা হয়। দক্ষিণদিকে অশ্বদ্বার। এখানে বিরাট একটী হনুমানের মূর্ত্তি আছে। এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া ডানদিকে একটী মন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ষড়ভূজ মূর্ত্তি আছে। চারি দ্বারের মধ্যে যে কোন দ্বার দিয়া সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিলে আর একটী দ্বার পাওয়া যায়। সেই দ্বার অতিক্রম করিলে শ্রীমন্দিরের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়।

শ্রীমন্দির চারি ভাগে বিভক্ত—মূলমন্দির, জগমোহন মন্দির, নাট মন্দির ও ভোগ মন্দির। মূলমন্দিরের অপর নাম মণিকোঠা। এই মন্দিরের চূড়া ১২৮ হস্ত উচ্চ। ইহা বিষ্ণুচক্র এবং ধ্বজা দ্বারা সুশোভিত। মূলমন্দিরের ভিতরে রত্নবেদী আছে। এই বেদী ১৬ ফিট দীর্ঘ, ১৩ ফিট প্রস্থ, ৪ ফিট উচ্চ এবং কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই বেদীতে লক্ষশালগ্রাম শীলা আছেন, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবলরামদেব, শ্রীশ্রীমতী সুভদ্রাদেবী এবং শ্রীশ্রীসুদর্শন চক্র স্থাপিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনকালে রত্নবেদী পরিক্রমণ করিতে হয় কিন্তু এ নিয়ম ভক্ত রক্ষা করিতে পারেন না, কারণ ভক্ত শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আত্মহারা হন, রত্নবেদীর পশ্চাৎভাগে যাইয়া দর্শনসুখে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করেন না। প্রাতে একবার এবং রাত্রে একবার মণিকোঠায় প্রবেশ করিতে পারা যায়, অন্যান্য সময়ে জগমোহন মন্দির হইতে

প্রভুকে দর্শন করিয়া থাকেন। জগমোহন ও নাট মন্দিরের মধ্যে দুইটী করিয়া চন্দনকাষ্ঠ লোহারশিকলে বাঁধা আছে। নাট মন্দিরে নাচ গান হইয়া থাকে এবং এই স্থানে যাহার যে ভাবে ইচ্ছা ভজন সাধন করিতে পারেন। ভোগমন্দিরে জগন্নাথদেবের অন্নভোগ হইয়া থাকে। ভোগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। জগন্নাথের সেবার জন্য নর্ত্তকী আছে। ইঁহাদিগকে দেবদাসী বলে। ইঁহারা ভোগের ও অন্যান্য সময়ে নৃত্য করিয়া থাকেন।

নাটমন্দিরের মধ্যে এবং ভোগমন্দিরের সম্মুখে একটী স্তম্ভ আছে, তাহার নাম গরুড়স্তম্ভ। এই স্তম্ভের উপর গরুড়মূর্ত্তি আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই স্তম্ভের উপর হাত রাখিয়া এবং নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। স্তম্ভের সম্মুখে একটী গর্ত্ত আছে, তাহা তাঁহার প্রেমাশ্রুপতনে হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এতদূর হইতে মহাপ্রভু কেন জগন্নাথ দর্শন করিতেন? ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ—শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিত্যানন্দাদির সহিত ৺জগন্নাথক্ষেত্রে আসিতেছেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথের দেউলধ্বজা দর্শন করিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হাসিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতে খাইতে আঠারনালায় আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাহারপর একাকী অচিরে জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া জগমোহনে দাঁড়াইয়া নীলাচলনাথকে দেখিলেন। জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তিনি আত্ম সংযম করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেগের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে করিবার জন্য তাঁহার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তিনি এক উল্লম্ফন প্রদান করিলেন। পরিহারিগণ ছড়িহাতে তাঁহাকে মারিবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দির

প্রাঙ্গনে পড়িয়াগেলেন। নিকটে উৎকল রাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তিনি ইহা দেখিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য সমাগত হইয়া হাঁ! হাঁ! করিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া পরিহারিগণ প্রহারে ক্ষান্ত হইল। সার্ব্বভৌম অপরূপ মূরত্তি সন্ন্যাসী দেখিয়া, তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য্য ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। তখন তিনি নানা উপায় দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য না হইতে পারিয়া স্বভবনে আনাইয়া এক নিভৃতকক্ষে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। এদিকে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরি সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন প্রহরকাল পরে গৌরসিংহ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাহারপর সমুদ্র স্নান ও প্রসাদ ভক্ষণের পর সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আপনি একাকী দর্শনে যাইবেন না! গোপীনাথ, তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ দর্শন করাইয়া আনিও।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইব না, বাহিরে গরুড়স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিব।" দ্বিতীয় কারণ—ভগবানকে দূর হইতে দেখিতে হয়, বোধ হয় জীবকে এই শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। এখন ও অনেক লোক এই স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রথমে দর্শন করিয়া থাকেন। এই স্থানে প্রদীপ দান এবং পূজাদি হইয়া থাকে।

শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। পূর্ব্বদিকে অগ্নীশ্বর শিব ও রামজীউ। দক্ষিণদিকে—সত্য নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, ছাইল ঠাকুর, অক্ষয় বট, গণেশ, মার্কণ্ড, মহাদেব, ইন্দ্রানী, সর্ব্বমঙ্গলা, অনন্ত, বাসুদেব, মুক্তীশ্বর, ক্ষেত্রপাল, মুক্তিমণ্ডপ, নৃসিংহ, মদন মোহন,

বাসুদেব, নন্দগোপাল, পাদপদ্ম, সাক্ষীগোপাল, গণেশ, গোপীনাথ, মাখন-চোর, সত্যভামা; কর্ম্মাবাই, সরস্বতী, ষষ্ঠী, ভদ্রকালী, নীলমাধব এবং লক্ষ্মী। উত্তরদিকে—নারায়ণ, সূর্য্য নারায়ণ, সূর্য্যদেব, রামলক্ষ্মণ, পাতাল মহাদেব, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম, বিষ্ণুপাদপদ্ম এবং কীর্ত্তন চড়কা।

শ্রীমন্দিরের গঠন প্রণালী দেখিয়া অনেক মহাত্মাই বলিয়া থাকেন যে ইহা জীবদেহের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। মূল মন্দিরের বহির্গাত্রে অনেক অশ্লীল ছবি আছে, সে সম্বন্ধে ও অনেকে নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহাত্মারা যাহা বলিয়া থাকেন তাহা কথনই অসঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক এই সমস্ত বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে জীবদেহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেহ তিনটী—কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি দুই প্রকার—মায়া ও অবিদ্যা। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কথিত হয় এবং এই অবিদ্যার নাম কারণ শরীর। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর এবং যে শরীর পিতৃ মাতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম বিশেষরূপ শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরস দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয় তাহাকে স্থূল দেহ বলে। এই ত্রিবিধ দেহ আবার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোষে বিভক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত আনন্দময় কোষের ভিতর আত্মারূপী ভগবান বাস করিতেছেন। স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলে। অন্নময় শরীরে বলাধান করতঃ ইন্দ্রিয়-গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিকারী পূর্ণস্বভাব পঞ্চবায়ুকে প্রাণময় কোষ বলে। ভ্রমদ্বারা অন্নময়াদি শরীরে অহংজ্ঞান এবং গৃহধনাদিতে মদীয় বুদ্ধিবিশিষ্ট

জাগ্রৎ অবস্থায় সর্ব্বশরীরে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে যে চৈতন্য ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধি তাহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। পুণ্যকর্ম্ম ফলভোগকালে চিদানন্দ প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট এবং ভোগ সমাপ্তিতে প্রকৃতিতে লীন হয় যে আন্তরীক-বৃত্তি তাহাকে আনন্দময় কোষবলে। গুটীপোকা যেমন কোষ নির্ম্মাণ করতঃ তদাচ্ছাদিত হইয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হয় আত্মা ও তদ্রূপ পঞ্চ-কোষ দ্বারা আবৃত হইয়া স্বরূপের বিস্মৃতি হেতু সংসার গতি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের দেহের মধ্যে সাড়ে তিন কোটী নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী যোগীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী তিন নাড়ী প্রধানা। মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া মেরুদণ্ড বেষ্টন করিয়া এই তিন নাড়ী মস্তকাভিমুখে গিয়াছে। বামভাগে ইড়ানাড়ী, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলানাড়ী এবং মধ্যে সুষুম্নানাড়ী। সুষুম্নার মধ্যে চিত্রানাড়ী এবং তাহার মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। এই তিন নাড়ী শরীরের মধ্যে ছয় স্থানে একত্রে মিলিত হইয়া ছয়টী চক্র উৎপন্ন করিয়াছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্র। সাধনার দ্বারা এই ছয়টী চক্রভেদ করিতে পারিলে শীর্ষোপরি সহস্রদলে পৌঁছিয়া পরমাত্ম দর্শন হইয়া থাকে।

জীবদেহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল, এক্ষণে ইহার সহিত শ্রীমন্দিরের সাদৃশ্য আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। শ্রীমন্দিরের বাহিরের চতুর্দ্দিক অর্থাৎ সিংহ প্রভৃতি দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত স্থানকে স্থূলদেহ কিম্বা অন্নময় কোষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে কারণ এই স্থানে শস্য সংগ্রহ, প্রসাদ প্রস্তুত, প্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তাহার দ্বারা স্থূলদেহ কিম্বা অন্নময় কোষের বলাধান হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের সহিত সূক্ষ্মদেহ কিম্বা প্রাণময়,

মূলমন্দিরের সহিত কারণদেহ কিম্বা আনন্দময় কোষের তুলনা হইতে পারে। শ্রীমন্দির চারিভাগে বিভক্ত যথা ভোগমন্দির, নাটমন্দির, জগমোহন মন্দির এবং মূলমন্দির ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভোগমন্দিরকে প্রাণময় কোষ, নটমন্দিরকে মনোময় কোষ, জগমোহন মন্দিরকে বিজ্ঞানময় কোষ এবং মূলমন্দিরকে আনন্দময় কোষ বলা যাইতে পারে। এক্ষণে ভোগমন্দিরকে প্রাণময় কোষ বলা যাইতে পারে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। বায়ুদ্বারাই শরীরস্থ যন্ত্র সকল চালিত হইতেছে, বায়ুদ্বারাই অন্ন পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে এবং বায়ুদ্বারাই ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ চালিত হইয়া শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রকে সতেজ করিতেছে। ভোগ পক্কশালায় পাক হইয়া ভোগমন্দিরে লওয়া হয়। তাহার পর উক্ত ভোগ নিবেদিত হইলে কতক রাজ বাড়ীতে যায়, কতক মঠে যায়, কতক আনন্দ বাজারে যায় এবং কতক খরিদ্দারেরা লয়, এইরূপে সমস্ত ভোগ বিলী হইয়া যায়। শরীরস্থ বায়ু যেরূপ অন্নপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাহার সারাংশ নানা যন্ত্রে চালিত করিতেছে, ভোগ মন্দিরেও সেইরূপ ভোগ নিবেদিত হইয়া নানাস্থানে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং প্রাণময় কোষের সহিত ভোগমন্দিরের তুলনা করা যাইতে পারে। মনোময় কোষেতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ক্রিয়া হইয়া থাকে। এদিকে নাটমন্দিরে নৃত্যগীত, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। নৃত্যগীত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য এবং ধ্যান ধারণা মনের কার্য্য। সুতরাং নাটমন্দিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ক্রিয়া হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই নাটমন্দিরের সহিত মনোময় কোষের তুলনা করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানময় কোষেতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির ক্রিয়া হইয়া থাকে। একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই জীব ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন। এদিকে জগমোহনে পৌঁছিতে পারিলে জগন্নাথ দর্শনের আর গোল থাকে না, গোল ততক্ষণ

যতক্ষণ জগমোহনের দরজা খোলা না থাকে। সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষের সহিত জগমোহনের তুলনা হইতে পারে। জীবদেহস্থ আনন্দময় কোষে পরমাত্মারূপী ভগবান বাস করিতেছেন। এদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মূলমন্দিরের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে আসিতে পারিলে জীবের আনন্দের সীমা থাকে না, প্রাণ ভরিয়া চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। সুতরাং মূল মন্দিরের সহিত আনন্দময় কোষের তুলনা করা যাইতে পারে।

ত্রিবিধ দেহ এবং পঞ্চকোষের সহিত শ্রীমন্দিরের তুলনা করা হইল। এক্ষণে শরীরস্থ ছয়টী চক্রের সহিত শ্রীমন্দিরের প্রধ.ন ছয়টী দ্বারের তুলনা করিতে হইবে। প্রধান ছয়টী দ্বার—(১) সিংহদ্বার (২) যে দ্বারে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিক্রয় হয় (৩) ভোগমন্দিরের পূর্ব্বদ্বার (৪) ভোগমন্দিরের পশ্চিম দ্বার (৫) নাটমন্দিরের পশ্চিম দ্বার (৬) জগমোহন মন্দিরের পশ্চিম-দ্বার। ষড়চক্র ভেদ করিয়া যেমন সহস্র দলে ভগবানকে দর্শন করিতে হয় সেইরূপ এই ছয়দ্বার অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাত্রীদিগকে ভোগমন্দিরের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে দেওয়া হয় না সুতরাং পাঁচটী দ্বার অতিক্রম করিলেইতো জগন্নাথ দর্শন হইতে পারে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উক্ত ছয়টী দ্বার সমসূত্রপাতে রহিয়াছে, দ্বারগুলি খুলিয়া দিলে মণি কোঠার ভিতর প্রবেশ না করিতে পারিলে ও জগন্নাথ দর্শন হইয়া থাকে এবং ভোগমন্দিরের ভিতর দিয়া সাধারণ লোক যাইতে না পারিলেও পাণ্ডা সকল কিম্বা জগন্নাথের সেবা কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের যাইতে কোন আপত্তি নাই। শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কয়েকটী দ্বার আছে তাহাদিগের সহিত

এই সকল দ্বারের কোন দ্বার দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন। এই সকল দ্বার উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে যোগপথ অবলম্বন করিয়া ষড়চক্র ভেদ করিতে না পারিলেই যে ভগবানের দর্শনলাভ হইবে না এমন কোন কথা নাই, একমাত্র প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের দর্শনলাভ হইয়া থাকে, এসম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং উক্ত ছয় দ্বারের সহিত ষড়চক্রের এবং শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দ্বারের সহিত চক্ষু এবং কর্ণের তুলনা হইতে পারে। ভগবানের রূপদর্শন এবং তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবন করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা যেমন অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার দর্শনলাভ হয় সেইরূপ যাত্রী সকল উত্তর ও দক্ষিণদ্বার দ্বারা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতি সত্বর ভগবানের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য, শ্রীমন্দির যে জীবদেহের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্দিরের বহির্গাত্রে যে অশ্লীল ছবি আছে সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন যে এই অশ্লীল মূর্ত্তি থাকিলে বজ্র পাত হয় না। কেহ বলেন বৌদ্ধদিগের এই মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্যই এই সকল অশ্লীল মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। অপর কেহ বলেন চিত্ত-স্থিরতা পরীক্ষা করিবার জন্য এই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে অর্থাৎ এই সকল মূর্ত্তিতে যাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হইবে তাহারাই দারুব্রহ্ম দর্শনে অধিকারী। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে জীব প্রকৃতির নিম্নস্তরে যত প্রকারের কুৎসিৎভাব আছে তাহাই দেখান হইয়াছে মাত্র। আবার নিম্নস্তর অতিক্রম করিলে জীব ক্রমশঃ কি প্রকার সুন্দর অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহাও দেখান হইয়াছে। মন্দিরের

স্তর উপরে দেবদেবী মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হইয়াছে, আবার মন্দিরের অন্তর্গাত্রে ভগবানের অবতারাদির মূর্ত্তি এবং সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রকটিত করা হইয়াছে। মহাত্মা নীলমাধব বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে বাহিরে জগতের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং ভিতরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কুটস্থ চৈতন্য স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে উক্ত অশ্লীল মূর্ত্তিগুলি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন, তবে মহাত্মারা যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার কোনটাই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমন্দিরকে আমরা জীবের সূক্ষ্ম শরীরের সহিত তুলনা করিয়াছি। এই সূক্ষ্ম দেহই প্রকৃত দেহ কারণ ইহা নির্ব্বাণ মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী। সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের তারতম্যানুসারে প্রত্যেকে এক এক প্রকার সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইজন্য প্রত্যেক জীবের প্রকৃতি ভিন্ন। সূক্ষ্ম দেহ বহু প্রকার হইলেও তন্মধ্যস্থ চৈতন্য অর্থাৎ আত্মা বিভিন্ন নহেন। সকল দেহের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের বহির্গাত্রস্থ অশ্লীলমূর্ত্তি ও দেব দেবী মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া বোধ হয় যে মহাপাপী হউক আর দেবতাই হউক সকলের মধ্যেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দির মধ্যস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব যেন বলিতেছেন, "জীব! তুমি পাপী হও আর দেবতাই হও কোন ভয় নাই। আমার মন্দিরের বাহিরের মূর্ত্তিগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিকর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে আমি দেবতার ন্যায় মহাপাপীকেও অঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছি। উভয়কেই সমভাবে স্নেহ করি বরং পাপীর প্রতিই আমার অনুগ্রহ অধিক কারণ পাপী আমাকে জানিতে না পারিয়া সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। আমি সেই জন্যই সাগরকুলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। পাপীকে

অন্তরে ও বাহিরে থাকিলেও তোমরা কর্ম্মদোষে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া আমার দর্শনলাভ করিতে পার না। আমি সেইজন্য তোমাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিব বলিয়াই দারুব্রহ্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আর তোমাদের ভয় নাই। আমার প্রতি বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক, শুচি অবস্থায় থাক আর অশুচি অবস্থায় থাক, আমার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া একবার মন্দির মধ্যে প্রবেশ কর, তাহা হইলে বহুজন্ম সঞ্চিত পাপ নষ্ট হইয়া আমার দর্শন পাইবে। আমার সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করিলে এবং মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে স্বীয় এবং পর দেহের মধ্যে আমাকেই দর্শন করিতে পারিবে এবং জীবনান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, আর তোমাদিগকে এই দুঃখতাপ পূর্ণ সংসারে আসিতে হইবে না।

---

# শ্রীমন্দিরের সেবক মণ্ডলী।

—:*:—

মন্দিরে ৩৬টী সেবক আছে। ইহাদিগকে ছত্রিশনিয়োগ বলিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রধান ১৫টী নিয়োগের নাম ও কার্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। পাণ্ডা নিয়োগঃ—ইঁহারা জগন্নাথদেবের পূজা কার্য্য করেন।

২। পশুপাল নিয়োগঃ—ইঁহারা ভগবানের বেশ করিবার জন্য পুষ্পাদি রক্ষা করিয়া থাকেন। শুদ্ধ ভাষায় পুষ্পপালক অথবা পশুদেবতা তাহাদের রক্ষা করার জন্য পশু পালক বলে।

৩। সূপকার নিয়োগ—ইহারা প্রভুর, পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৪। প্রতিহারী নিয়োগঃ—ইহারা বহির্দ্বারের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

৫। খুণ্টিয়া নিয়োগ ঃ—ইহারা মন্দিরান্তর্ব্বর্ত্তী কপাট সকলের রক্ষক।

৬। গরাবডু নিয়োগ—ইহারা সমস্ত দেবতাদিগের আবশ্যক মত জল যোগায়।

৭। বিমানবডু নিয়োগ ঃ—ইহারা প্রভুর যাত্রা সময়ে বিমান বহন করে।

৮। দইতা নিয়োগ ঃ—ইহারা দেবতার কলেবর পরিবর্ত্তন এবং পাহণ্ডি বিজয় প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৯। বিদ্যাপতি নিয়োগ ঃ—ইহারা দেবতার দয়িতাদিগের সহিত সমস্ত কার্য্য এবং অবসর সময়ে পূজা সম্পাদন করে।

১০। ভিতরছেউ নিয়োগ ঃ—ইহারা মন্দিরের ভিতরের দ্বার সকল মুদ্রা চিহ্ন দিয়া বন্ধ করে এবং সময়ে সময়ে দেবতার পূজাও করে।

১১। সেকাপ নিয়োগ—ইহারা মন্দিরের যাবতীয় পদার্থের রক্ষক।

১২। তটাউ নিয়োগঃ—ইহারা মন্দিরের যাবতীয় কার্য্যের লেখক।

১৩। দেউল করণ নিয়োগ ঃ—ইহারা মন্দিরের আয় ব্যায় লেখক।

১৪। উড়িষ্যার রাজ নিয়োগঃ—ইঁহারা স্নান পূর্ণিমা প্রভৃতি সময়ে কতক সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৫। মুদিরথ নিয়োগ ঃ—ইঁহারা রাজার অনুপস্থিতি সময়ে রাজকীয় কার্য্য সকল প্রতিনিধি স্বরূপে নির্ব্বাহ করেন।

আবহমান কাল হইতেই পুরীমন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত অতীব সুন্দর। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কার্য্যে অনুরাগ সহকারে উপস্থিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য-নির্ব্বাহ কোথায় ও দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবল পুরুষকার দ্বারা যদি কার্য্য পরিচালিত হইত তাহা হইলে এই সুশৃঙ্খলভাব এত দিন স্থায়ী

এ সুশৃঙ্খলভাব এতদিন স্থায়ী আছে। ইহা ভিন্ন আর একটী কারণ আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে পরার্দ্ধকাল এখানে বাস করিবেন। "তাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন" এই জন্যই এত সুশৃঙ্খলা। সেবকদিগের ও মনের ভাব সেইরূপ নতুবা এমনসুন্দর ভাবে কার্য্য চলিত না।

# নিত্য পূজা পদ্ধতি।

অতিপ্রত্যূষে দ্বার খুলিয়া মঙ্গল আরতি হয়। তৎপর দন্তধাবন ও স্নান হয়, তাহার পর শিঙ্গার হয়, পরে ধূপ বা বাল্য ভোগ হইয়া থাকে। বাল্যভোগে ক্ষীর, নবনীত, দধি, নারিকেল, মুড়কি, মাখন, পাপরী এবং হংসকলী প্রদত্ত হয়। তৎপরে খেচরান্ন, বড়া, পিষ্টক, অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা রাজভোগ হয়। তাহার পর তিপুরী, নারী, আরিসা, মাধুকুরী মালপুয়া, উপাধিভোগ, অন্ন, ব্যঞ্জন, সরগুয়ারী, পাখাল, সরবত, বড়াপিঠা, ঘি ভাত ইত্যাদি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোগ হয়। পরে শিঙ্গার অর্থাৎ বেশ হয়। ইহার পর আরতি হইয়া বেলা চারিটা পর্য্যন্ত দ্বাররুদ্ধ থাকে—এই সময়ে জগন্নাথ নিদ্রা যান। ৪টার পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে জিলাপী ভোগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় আরতি হইলে পর সান্ধ্য ভোগ দেওয়া হয়। ইহাতে খাজা, গজা, মতিচূর, দধি প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য দেওয়া হয়। সান্ধ্যভোগের

নৈশভোগের পূর্ব্বে পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত হন। এই সময়ে বীনাবাদ্য ও গীতগোবিন্দ পাঠ হইয়া থাকে।

গীতগোবিন্দ পাঠ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। কোন সময়ে একটী স্ত্রীলোক বেগুনক্ষেত্রে বেগুন তুলিতেছিল আর গীত গোবিন্দ গাহিতে ছিল। গীতগোবিন্দ ভগবানের এত প্রিয় যে সেই বেগুনক্ষেত্রে গীত গোবিন্দ গান শুনিতে উপস্থিত হইলেন। বেগুনওয়ালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হওয়াতে তাঁহার উত্তরীয় বসন ছিন্ন হইয়াছিল। বসন ছিন্ন হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সেবক সকল সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন। গীতগোবিন্দ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই দিন হইতে মন্দিরে গীতগোবিন্দ পাঠ আরম্ভ হয়। অদ্যাপি প্রত্যহ গীতগোবিন্দ পাঠ হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে নৈশ ভোগ হয়। নৈশভোগে নানাবিধ ঘৃতপক্ক দ্রব্য, পিষ্টক এবং গোপাল বল্লভ প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য দেওয়া হয়। ভোগান্তে দেবদাসীর নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি হয়। তাহার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রাত্রিনিদ্রা হয়। মোট কথা জগন্নাথদেব দিবারাত্রি আহার এবং মানুষের ন্যায় ভোগবিলাসে রত থাকেন। তিনি আত্মারাম, ভোগবিলাসে স্পৃহা নাই তবে এসব বন্দোবস্ত কেন হইয়াছে? সেবকদিগের ঐকান্তিকী ভক্তির ফল ভিন্ন আর কিছুনয়। যাহাকে আন্তরিক ভালবাসা যায় তাহাকে যেমন ভাল বেশ ভূষা করাইতে এবং বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য খাওয়াইতে ইচ্ছা হয় ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ধন্য জগন্নাথদেবের সেবক বৃন্দ! তাঁহাদিগের ভক্তির বিষয় চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এত ভালবাসা, এত ভক্তি, এতপ্রেম যদি না হইবে তাহা হইলে কি ভগবান পরার্দ্ধকাল পুরুষোত্তমে বাস করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইতেন?

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্ত্রে হইয়া থাকে। পূজার নিয়ম তান্ত্রিক ও বৈদিক মতের সামঞ্জস্য করিয়া বিহিত হইয়াছে। এখানে শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ নাই। নীচ জাতিতে যে হেয় জ্ঞান তাহাও এখানে নাই।

---

# দারুব্রহ্ম।

## মহাপ্রসাদ।

অন্ন যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাকশালায় থাকে ততক্ষণ মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য হয় না। নিবেদনের পর হইতেই ইহা মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য হয়, তখন স্পৃষ্ট দোষ থাকে না। এই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র, পিতৃ ও দেব কর্ম্মে উৎসর্গ করিলে পিতৃগণ এবং দেবগণ অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন। ইহা ভক্ষণ করিলে অতিপাতক মহাপাতকাদি সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। সুতরাং মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্র কোন বিচার না করিয়া ভক্ষণ করিবেন। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি যথা ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে—

অতিপাতক পাপানি মহা পাপানি যানি চ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি জগন্নাথান্নভক্ষণাৎ॥

অতি পাতপ. মহা পাতকাদি সমস্ত পাপ জগন্নাথদেবের অন্নভক্ষণ

গরুড়পুরাণে—

ন কাল নিয়মো বিপ্রা ব্রতে চান্দ্রায়ণে তথা।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভুঞ্জীয়াৎ যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ॥

মহাপ্রসাদ ভক্ষণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। চান্দ্রায়ণ ব্রতের ও কোন কাল নিয়ম নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্র কোন বিচার না করিয়া ভক্ষণ করিবেন।

স্কন্দপুরাণে—

মহাপবিত্রং হি হরের্নিবেদিতং
নিয়োজয়েদ্ যঃ পিতৃদেবকর্ম্মষু।
তৃপ্যন্তি তস্মৈ পিতরঃ পুরা তথা
প্রয়ান্তি লোকং মধুসূদনস্য তে॥

হরিকে নিবেদিত অন্ন অতি পবিত্র। পিতৃকর্ম্মে ও দেব কর্ম্মে উৎসর্গ করিলে সমস্ত পিতৃকুল ও দেবতাগণ তৃপ্তিলাভ করেন এবং তাঁহারা ভগবদ্ধামে গমন করেন।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূর দেশতঃ।
দুর্জ্জনেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্ব্বস্যৈবাঘ নাশনং॥

শুষ্ক, পর্য্যুষিত কিম্বা একদেশ হইতে অন্য দেশে নীত হউক, অস্পৃশ্য জাতি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলেও সেই মহাপ্রসাদে সমস্ত পাপ নাশ হয়।

এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। একদা এক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সপরিবারে জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি যথা বিধি কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন কিন্তু মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন না। এই মহাপাপে তিনি অচিরাৎ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এরূপ পাপজব্যাধি তাঁহার হঠাৎ কেন হইল তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলেন

ভাবিতে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে মহাপ্রসাদ অবজ্ঞা করিবার জন্য তাঁহার মহাপাপ হইয়াছে এবং সেই জন্যই এই কঠিন রোগ হইয়াছে। তাহার পরদিন তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে মহা-প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইলেন।

শ্রীক্ষেত্র প্রেমের ক্ষেত্র, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের অতীত। ব্রাহ্মণ ইহা জানিতেন না সেই জন্যই মহাপ্রসাদ অবজ্ঞা করিয়া কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ গল্প অনেক আছে।

# দারুব্রহ্ম।

## শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দ্বাদশ মাসের উৎসবাদি।

——:*:——

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বাদশমাসে যে যে উৎসব হইয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠার তারিখে তাঁহার স্মৃতির জন্য স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্নানযাত্রা প্রথম ধরিয়া উৎসব গুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

উৎসবাদির নাম—১। স্নান যাত্রা। ২। নবযৌবন। ৩। নেত্রোৎসব বিধি। ৪। রথযাত্রা। ৫। হোরা পঞ্চমী। ৬। পুনর্যাত্রা। ৭। শয়নযাত্রা। ৮। দক্ষিণায়ন। ৯। ঝুলনযাত্রা। ১০। পার্শ্বপরিবর্ত্তনযাত্রা। ১১। জন্মাষ্টমী। ১২। বনভোজিবেশ। ১৩। কালীয়দমন। ১৪। প্রলম্বাসুর বধ। ১৫। বামণ জন্ম। ১৬। রাজবেশ। ১৭। রাধাদামোদরবেশ। ১৮। তিয়াক্রিয়া, শ্রাদ্ধ

কিয়া, থালিকিয়া, ডালিকিয়া, বাঙ্কোজুড়া ও নাগার্জ্জুনবেশ। ১৯। উত্থান একাদশী। ২০। রাসযাত্রা। ২১। পার্ব্বণ। ২২। পূষ্যাভিষেক। ২৩। মালচুলবেশ। ২৪। পদ্মবেশ। ২৫। গজোদ্ধারণবেশ। ২৬। মকর সংক্রান্তি। ২৭। চাচরিবেশ। ২৮। দোলযাত্রা। ২৯। রামনবমী। ৩০। দমনক ভঞ্জিকা। ৩১। চন্দনযাত্রা। ৩২। রুক্মিনী হরণ।

রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা গমন করেন না। মদন মোহন ইঁহাদের প্রতিনিধিরূপে যাইয়া থাকেন। এই সকল উৎসবের দিনে জগন্নাথ দর্শনে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার যে সকলবেশ হইয়া থাকে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

## ১। স্নানযাত্রা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই তিথিতে, জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং এই তিথিকে জগন্নাথের জন্মতিথি বলা যাইতে পারে। এই দিনে মূর্ত্তিত্রয়কে স্নান বেদীতে স্থাপন করা হয়। প্রাতঃকালে রোহিণী কুণ্ডের পূর্ব্বদিনের অধিবাসিত জলে প্রভুকে স্নান করাইয়া গণেশবেশ দ্বারা ভূষিত করা হয়। যাঁহারা রথ যাত্রায় আসিবেন তাঁহারা অনেকেই এই সময় আসিয়া থাকেন। এই সময় জগন্নাথ বড়ই কৃপালু—সমস্ত লোকের সহিত কোল দিয়া থাকেন। এই জন্য স্নানের পর অত্যন্ত লোকের ভিড় হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গণেশবেশ সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কর্ণাটদেশের জনৈক ভক্ত শুনিতে পাইলেন যে ভগবান দারুব্রহ্মরূপে

স্নান যাত্রার দিনে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। পুরীতে উপস্থিত হইয়া তিনি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে গেলেন। তিনি ভগবানকে গণেশ-রূপে ভজনা করিতেন কিন্তু ভগবানকে গণেশরূপে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া চলিলেন। "যে যথামাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ইত্যাদি ভগবৎবাক্য মিথ্যা হয় মনে করিয়া ভগবান গণেশরূপ ধারণ করিলেন এবং ভক্তকে ফিরাইবার জন্য পাণ্ডাদিগকে আদেশ করিলেন। পাণ্ডারা ব্রাহ্মণকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন। তখন ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন এবং ভগবানের গণেশরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে তোমাকে চিরদিন এই দিনে এইবেশ ধারণ করিতে হইবে। ভগবান তাহাই স্বীকার করিলেন। সেই জন্য স্নান যাত্রার দিনে জগন্নাথের গণেশ বেশ হইয়া থাকে।

স্নান যাত্রার পর জগন্নাথের জ্বর হয় এরূপ পাণ্ডা সকল বলিয়া থাকেন। জ্বর হইলে অন্নভোগ হয় না, তখন জগন্নাথ ঔষধাদি ও পাচন সেবন করেন। ভগবানের জ্বর, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অসম্ভব নয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পূর্ণব্রহ্ম ভগবান হইলে ও দারু কলেবর ধারণ করিয়াছেন এবং সেবক সকল ও পার্থিব দেহধারী। মনুষ্য মাত্রেরই জ্বর হইয়া থাকে, সুতরাং ভক্ত যে তাঁহার ইষ্টদেবতার জ্বর হইয়াছে মনে করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি! এপ্রেমের ক্ষেত্র। সমস্ত কার্য্যেই প্রেমের লীলা খেলা। গ্রন্থকারের হৃদয়ে সে প্রেম নাই, সে কল্পনাশক্তি নাই, সে ভাষাও নাই, সুতরাং বুঝাইতে অক্ষম।

## ২। নব যৌবন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গরাগ কথাকে নবযৌবন বলে। স্নানযাত্রার

১৫ দিন পর অমাবস্যার দিন নবযৌবন হইয়া থাকে। একবৎসর পরে রংকরার জন্য মূর্ত্তি নূতন দেখায় এবং সেই জন্য জগন্নাথদেবের নবযৌবন হইয়াছে বলা হয়। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর দর্শন পাইবে বলিয়া বহু-লোকের সমাগম হইয়া থাকে। যাহাতে যাত্রীগণের দেখিবার সুবিধা হয় সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

## ৩। নেত্রোৎসব বিধি।

এই উৎসব শুক্লপক্ষের প্রতিপৎতিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব স্নানের পর পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত মহালক্ষ্মীর সহিত নিভৃতে থাকেন। তাহার পর নেত্রোৎসব হয়। ১৫ দিন পরে সকলে জগন্নাথ দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তিসাধন করেন বলিয়া ইহার নাম নেত্রোৎসব। ইহা অপেক্ষা আর নয়নের তৃপ্তি সাধন কি হইতে পারে?

## ৪। রথযাত্রা।

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হয়। এই সময় নানা দেশ হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। যতরকম উৎসব আছে তাহার মধ্যে রথযাত্রা সর্ব্বপ্রধান। এই ব্যাপার দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত ৯ দিন স্থায়ী হয়।

সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়া উত্তরদিকে যে প্রশস্ত রাস্তা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহাকে বড় দাণ্ড বা রথের রাস্তা বলে। রথের সময় এই রাস্তা এবং রাস্তার দুই ধারের দালানের ছাদ লোকে পরিপূর্ণ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পুলিশ সহ পুলিশ সাহেব উপস্থিত থাকেন।

প্রতিবৎসর তিনখানি নূতন রথ প্রস্তুত হয়। জগন্নাথদেবের রথ ২৩ হাত উচ্চ, বলরামের রথ ২২ হাত উচ্চ এবং সুভদ্রা দেবীর রথ ২১

হাত উচ্চ। জগন্নাথদেবের রথের ১৬ চাকা, ইহাকে নন্দীঘোষ রথ বলে। বলরামের রথের ১৪ চাকা, ইহাকে তালধ্বজ রথ বলে। সুভদ্রা দেবীর রথের ১২ চাকা, ইহাকে পদ্মধ্বজ রথ বলে। নারিকেলের ছোবড়ায় নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা রথ টানা হয়।

বেলা ১২।১টার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে আসেন। প্রথমতঃ বলরাম, তৎপর সুভদ্রাদেবী এবং অবশেষে জগন্নাথদেব রথে আসেন। দেড়ঘণ্টা আন্দাজ পর রথ চলে। এই সময় বহু কীর্ত্তন হইয়া থাকে। "রথেতু বামণং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই বিশ্বাসের জন্য সকলে প্রাণভরিয়া ভক্তি সহকারে রথের উপর জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে থাকেন। প্রথমে বলরামের রথ, তাহার পর সুভদ্রার রথ এবং পরিশেষে জগন্নাথদেবের রথ চলিতে থাকে। এইরূপে সারাদিনে রথ গুণ্ডিচা বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রথমদিন মূর্ত্তিত্রয় যজ্ঞবেদীর নিকট সায়ংকালে উপস্থিত হয়। সেই দিন রাত্রে প্রভুদিগকে "পাহুণ্ডি" করাইয়া যজ্ঞবেদীস্থ রত্নসিংহাসনে স্থাপন করা হয়। উক্তবেদীতে ৭ দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই সপ্তদিন অন্ন পিষ্টকাদি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। নবমদিবসে খুব ভোরবেলায় খেচরান্ন ভোগ দিয়া জগন্নাথ দেবকে রথারূঢ় করা হয়।

রথ চলিতে চলিতে থামিয়া যায় এরূপ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। ভক্তবৎসল হরি ভক্তের মান চিরকালই রক্ষা করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে নিম্নে একটী গল্প লিখিত হইল ইহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ভক্তের উপর ভগবানের কিরূপ দয়া।

বলরামদাস নামক কোন এক ভক্ত ইন্দ্রিয় সংযম করিতে নাপারায় রথযাত্রার দিন কোন বেশ্যার গৃহে গমন করেন। সে দিন যে রথযাত্রা

তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। রথযাত্রা না দেখিতে যাওয়ার জন্য বারাঙ্গনা তাঁহাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করে। তখন বলরাম দাস অপবিত্র শরীরে দৌড়াইয়া রথের উপর উঠিতে গেলেন কিন্তু সেবক সকল তাঁহার চরিত্র মন্দ শুনিয়া রথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বলরাম দুঃখেও অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া রথস্থান ত্যাগ করিয়া চক্রতীর্থে গমন করিলেন। সে স্থানে বালুকা দ্বারা তিন খানা রথ প্রস্তুত করিয়া জগন্নাথের রথযাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তের টানে ভগবান বালুকা নির্ম্মিত রথে আবির্ভূত হইলেন। এদিকে জগন্নাথের রথ চলা বন্ধ হইল—সহস্রলোক এবং হস্তী প্রভৃতি দ্বারা রথ টানা হইল, কিছুতেই রথ চলিল না। সকলে হতাশ হইয়া পড়িল, রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের নিকট ধরনা দিলেন। ভগবান রাজাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন যে আমার প্রিয় ভক্ত বলরামদাস অপমানিত হইয়াছে, তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে রথ চলিবে। রাজা এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া আনন্দ সহকারে প্রাতঃকালে সেবক সহিত বলরাম দাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। বলরাম দাস রাজার নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিমুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যদি এত দয়াই না থাকিবে তবে লোকে তাঁহাকে ভক্ত বৎসল কেন বলিবে। বলরামদাস আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতপদে রথের স্থানে উপস্থিত হইয়া জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি রথ ঠেলিতে আরম্ভ করিলেন, রথ পুনরায় চলিতে লাগিল এবং অনায়াসে গুণ্ডিচাবাড়ী পৌঁছিল।

পুরীতে যেরূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে সেইরূপ ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই উৎসব হইয়া থাকে। বৌদ্ধ মন্দিরে ও রথযাত্রা হয়।

## ৫। হোরা পঞ্চমী।

রথযাত্রার পর পঞ্চমীতিথিতে এই উৎসব হয়। দ্বিতীয়া হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত প্রভুর মন্দিরে আগমন না হওয়াতে লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া সখিগণ সহ শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচা বাড়ী গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডাগণকে নানারূপ ভৎর্সনা, প্রহার এবং বন্ধন করেন। তিন চারি দিন মধ্যে প্রভুসহ শ্রীমন্দিরে ফিরিবার অঙ্গীকার করিলে লক্ষ্মদেবী পাণ্ডাদিগের বন্ধন মোচনান্তর প্রত্যাগমন করেন।

## ৬। পুনর্যাত্রা।

দশমীর দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা হয়। প্রথম দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মন্দিরে প্রবেশ করেন না। দ্বিতীয় দিবস রথোপরি থাকিয়া তৃতীয় দিবস শেষ বেলায় রথ হইতে অবতরণ করেন। বলরাম ও সুভদ্রা প্রথমতঃ মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাহার পর লক্ষ্মীর আদেশে কপাটবন্ধ হইয়া যায়। জগন্নাথের পক্ষে পাণ্ডারা এবং লক্ষ্মীর পক্ষে দেবদাসীরা কথোপকথন করিয়া থাকেন। জগন্নাথের পক্ষ হইতে পাণ্ডারা অনেক বস্ত্রালঙ্কারের প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন কিন্তু লক্ষ্মীদরজা পরিত্যাগ করেন না। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে যখন জগন্নাথ অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করেন তখন কপাট খুলিয়া দেওয়া হয়। কোন ভক্তের ইচ্ছানুসারে যে এই প্রেমের লীলা হইয়া থাকে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

## ৭। শয়ন যাত্রা।

আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে সান্ধ্য ভোগের পর এই উৎসব হইয়া থাকে। তাহার পর জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি মূর্ত্তি হস্তিদন্তপালঙ্কে

## ৮। দক্ষিণায়ন।

আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিবসে উৎসব হইয়া থাকে। প্রথমভোগ অন্তে দক্ষিণায়নবিধি আরম্ভ হয় এবং মধ্যাহ্ন ভোগের পূর্ব্বে তাহা শেষ হয়। এই দিনে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করিলে বিষ্ণুলোকে গমন হইয়া থাকে।

## ৯। ঝুলন যাত্রা।

শ্রাবণ মাসের শুক্লাএকাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব বিশেষ জাঁক জমকের সহিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ মুক্তিমণ্ডপে ঝুলন হইয়া থাকে। সাজ সজ্জা খুব ভাল হয়। মদনমোহন প্রতিনিধি স্বরূপ এই উৎসব করিয়া থাকন।

পুরীতে অনেক মঠে ঝুলন হয়। ইমার মঠ, উত্তরমঠ প্রভৃতি কতিপয় স্থানে বেশ সুন্দর সাজান হয়।

## ১০। পার্শ্বপরিবর্ত্তন যাত্রা।

ভাদ্রমাসের শুক্লাএকাদশী তিথিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সন্ধ্যাভোগের শেষে এই উৎসব হয়। শয়ন প্রতিমার নিকটে অগ্নিশর্ম্মা মুদিরথ পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া প্রতিমার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াদেন। এই তিথিতে জগন্নাথ দর্শনে বিশেষ ফল হয়।

## ১১। জন্মাষ্টমী।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহাসমারোহের সহিত এই উৎসব হয়। নাটমন্দিরের ভিতরে এই উৎসব হইয়া থাকে। বালরূপী শ্রীকৃষ্ণ দোলায় ঝুলিতে থাকেন। জন্মোৎসব উপলক্ষে অনেক নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

## ১২। বনভোজি বেশ।

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদিগের সহিত বনভোজন করিয়াছিলেন। ভগবানের এই বাল্যলীলা স্মরণার্থ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাদশমীর দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বনভোজিবেশ হইয়া থাকে।

## ১৩। কালীয়দমন।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাএকাদশী তিথিতে মদনমোহন মার্কণ্ড সরোবরে সর্পের উপর কালীয়দমন উৎসব করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ও কালীয়দমনবেশ হইয়া থাকে। এ বেশ দেখিতে সুন্দর।

## ১৪। প্রলম্বাসুর বধ।

কৃষ্ণাবতারে বাল্যলীলার সময়ে বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা স্মরণার্থ জগন্নাথদেব প্রভৃতির সুন্দর বেশ হয়।

## ১৫। বামন জন্ম।

প্রহ্লাদের পৌত্রবলি অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে দেবতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইন্দ্রলোক অধিকার করিয়াছিলেন।

ভগবান বিষ্ণু দেবতাদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য বামনরূপে কশ্যপ মুনির গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহারপর বলিরযজ্ঞে বামনদেব উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি ছলনা বুঝিতে পারিয়াও ত্রিপাদভূমি দান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বামনদেব দুইপদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত অধিকার করিয়া নাভিদেশ হইতে তৃতীয়পাদ বাহির করিয়া স্থান চাহিলেন। তাহারপর তাঁহার পত্নী বৃন্দাবলীর পরামর্শে ঐ পদ

বলির আর সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। বৃন্ধাবলী স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিকে পাতালে পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারের দ্বারী হইয়া থাকিলেন এবং ভক্তবৎসল নামের পরিচয় দিলেন।

ভগবানের উক্তকার্য্য স্মরণার্থ ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই কেবল জন্মতিথি পূজা হইয়া থাকে। পরদিন অর্থাৎ ত্রয়োদশীর দিন ভগবানের ছত্র, কমণ্ডলু প্রভৃতি যুক্ত বামনবেশ হইয়া থাকে।

## ১৬। রাজবেশ।

বিজয়া দশমীর দিবস জগন্নাথদেবের রাজবেশ হইয়া থাকে। সুবর্ণের হস্তপদাদি লাগান হয়। সুবর্ণের অলঙ্কার এবং সুন্দরবেশ ভূষায় রাজার ন্যায় প্রভুকে সাজান হয়। এই রাজবেশ দেখিতে অতীব সুন্দর।

## ১৭। রাধাদামোদর বেশ।

বিজয়া দশমীর পরদিন হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃষ্ণবেশ হইয়া থাকে।

## ১৮। ঠিয়াকিয়া, আড়কিয়া, থালিকিয়া, ডালিকিয়া, বাঙ্কোজুড়া এবং নাগার্জ্জুন বেশ।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই সকল বেশ হইয়া থাকে। সুবর্ণের কেওয়া ফুল জগন্নাথের মস্তকোপরি নানাভাবে দেওয়া হয় সেই জন্য বেশের নাম নানা প্রকার হইয়াছে।

## ১৯। উত্থান একাদশী।

কর্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী-তিথিতে প্রথম ভোগের পর এই উৎসব হইয়া থাকে। পূজার পর জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান হয়। এই দিনে ভগবানকে দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠে গমন হইয়া থাকে।

## ২০। রাসযাত্রা।

কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতিথিতে রাত্রিকালে রাসযাত্রা সম্পন্ন হয়। এই সময়ে অনেক লোকের সমাগম হয়।

## ২১। পার্ব্বণ।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতিথিতে বাল্যভোগের পর জগন্নাথদেবকে নূতন পট্টবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ইহার নাম পার্ব্বণ যাত্রা।

## ২২। পুষ্যাভিষেক।

পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাল্য ভোগের পর জগন্নাথদেবের পূজা ও অভিষেক হয়। মূর্ত্তিত্রয়কে রাজবেশে সজ্জিত করা হয়।

## ২৩। মাল চূল বেশ।

পৌষমাসের সংক্রান্তির দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ফুলের টোপর মাথায় দিয়া সজান হয়। এইরূপ সাজানকে মালচূলবেশ বলে।

## ২৪। পদ্মবেশ।

শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বে কোন শনিবারে পদ্মপত্র ফুল প্রভৃতি দ্বারা মূর্ত্তিত্রয়কে অতি সুন্দরভাবে সাজান হয়। অন্য কোন বেশে ভগবান শয়ন করেন না কিম্বা পদ্মবেশের দিন শয়ন করিয়া থাকেন।

## ২৫। গজোদ্ধারণবেশ।

মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গজোদ্ধারণবেশ হয়। ভগবানের এই বেশ দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত ও তাঁহার দয়াতে বঞ্চিত হয় না। যে কেহ হউক না কেন প্রাণ ভরিয়া একবার ডাকিলেই তিনি তাহাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তবে ডাকার মত না ডাকিতে পারিলে কোন ফল হয় না। এক সময়ে একটী গজ নদীতে স্নান করিবার জন্য নামিয়াছে, এমন সময় একটী কুম্ভীর তাহাকে আক্রমণ করে। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হয় কিন্তু কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে গজ অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে অন্তিমকালে নারায়ণের শরণাপন্ন হইল। ভক্তবৎসল ভগবান আর কি থাকিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ গজকে উদ্ধার করিলেন। উভয়ে শাপগ্রস্ত হইয়া পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভগবৎস্পর্শে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিল। এই বেশ দেখিতে অতিসুন্দর।

## ২৬। মকর সংক্রান্তি।

এই উৎসব মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে তণ্ডুল প্রভৃতি নানা দ্রব্য মন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। সেই তণ্ডুল সংক্রান্তির দিন জলে ধৌত করিয়া সর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সহকারে ঘৃত পক্ক পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীমন্দিরের চারিধারে ৮০ বার প্রদক্ষিণ করান হয়, তাহার পর প্রভুর নিকট ভোগ দেওয়া হয়।

## ২৭। চাচরি বেশ।

ইহাকে দোলবেশ বলে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা দশমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ৫ দিন এই বেশ হইয়া থাকে।

## ২৮। দোলযাত্রা।

ফাল্গুন মাসের দশমী-তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যাধূপের পর মদনমোহন, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত মণিখচিত বিমানে আরোহণ করতঃ মন্দির হইতে বাহির হইয়া নানাবিধ বাদ্যোত্তম সহকারে দোল বেদীতে যাইয়া থাকেন। তৎপর ভক্তগণ যথেচ্ছরূপে ভগবানকে আবীর দিয়া থাকেন। রাত্রিতে পুনরায় মণিবিমানে আরোহণ করিয়া মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। এই দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রাজবেশ হইয়া থাকে। প্রভুকে কেবল খৈ, বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়।

## ২৯। রামনবমী।

চৈত্র শুক্লানবমীতে মদনমোহনকে রামবেশে সাজাইয়া পূজা দেওয়া হয়। এই দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রঘুনাথ বেশ হইয়া থাকে। এই বেশে অনেক টাকা ব্যয় হয় সেই জন্য প্রতি বৎসর হয় না। যেবার কোন ভক্ত সমস্ত ব্যয় বহন করেন সেবার এই বেশ হইয়া থাকে।

## ৩০। দমনক ভঞ্জিকা।

চৈত্র শুক্লাত্রয়োদশীতে জগন্নাথবল্লভ বাগানে মদনমোহনের পূজা হয়। পরদিবস প্রভুকে "দমনক বা দয়না মঞ্জরী" অর্পণ করা হয়। শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য সমস্ত উৎসব এই খানে সম্পন্ন হয়। কোন উৎসব শ্রীমন্দিরে এবং কোনটী জগন্নাথবল্লভ মঠে অনুষ্ঠিত হয়।

## ৩১। চন্দন যাত্রা।

এই যাত্রায় ভগবানকে চন্দন লেপন করা হয় বলিয়া ইহার নাম

মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শেষ হয়। প্রতিদিন দুই প্রহরের পর মদনমোহন, লক্ষ্মী, ধরাদেবী এবং পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিমানারূঢ় হইয়া নরেন্দ্র সরোবর সমীপে গমন করেন। সেবকগণ স্বর্ণছত্র ধারণ এবং রৌপ্য চামর ব্যজন এবং ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে যাইয়া থাকেন। রাস্তায় স্থানে স্থানে চালাঘর নির্ম্মিত হয়। সেই সেই স্থানে মদনমোহন বিশ্রাম করিয়া থাকেন এবং ভোগ দর্শন করিতে করিতে সরোবরতীরে উপস্থিত হন। দুইটী নৌকাতে একটী করিয়া চাপ নির্ম্মিত হয়। দুইখানি চাপ সুসজ্জিত করা হয়। এক চাপে মদনমোহন, লক্ষ্মী ও ধরাদেবী এবং অন্য চাপে রামকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব বিরাজমান হন।

চাপদ্বয় দিবাভাগে সরোবরের চতুঃপার্শ্বে একবার পরিভ্রমণ করে। তাহারপর সরোবর মধ্যস্থ মন্দির মধ্যে ঠাকুর সকলকে স্থাপন করা হয়। তৎপরে নৃত্য, গীত, ভোগ ইত্যাদি হয়। তদনন্তর চাপে উঠিয়া তিনবার সরোবরের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া রাত্রি ১২।১ টার সময় মন্দিরে আসেন। প্রত্যহ নরেন্দ্র সরোবরে বহুলোকের সমাগম হয় এবং প্রভুর জলক্রীড়ার সময় নগরবাসিগণ ও অবগাহন করিয়া থাকেন।

## ৩২। রুক্মিণী হরণ।

এই উৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে হয়। শ্রীমতী রুক্মিনী, বিমলাদেবীর গৃহে পূজা দিয়া যখন বাহিরে আসেন তখন মদন মোহন তাঁহাকে হরণ করিয়া রথে আনয়ন করেন। দুইটী দল হইয়া থাকে—এক দল শিশুপালের, অপর দল শ্রীকৃষ্ণের। উভয় দলে যুদ্ধ হয় এবং শিশুপাল পরাজিত হন। তখন বলরাম আসিয়া শিশুপালকে ছাড়িয়াদেন। মদনমোহন শ্রীমতীকে লইয়া গিয়া রাত্রে বিবাহ করেন।

# শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর।

দ্বাদশ বর্ষ অন্তে যে বার আষাঢ় মাস মলমাস হয়, সেই বর্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর হইয়া থাকে। নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। তাহার পর নূতন মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই মূর্ত্তিব ভিতর পূর্ব্ব মূর্ত্তি মধ্যস্থ ব্রহ্মবস্তু স্থাপন করা হয় এবং পুরাতন মূর্ত্তিত্রয় বৈকুণ্ঠধামে রাখা হয়। প্রবাদ আছে যে যিনি ব্রহ্মবস্তু নূতন মূর্ত্তির ভিতর স্থাপন করেন, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি ৬।৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে কিন্তু একথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ৩৬ বৎসর পরে ১৯১২ সালে নবকলেবর হইয়াছিল। নবকলেবর সময়ে বহুলোকের সমাগম হয়।

# পুরীর প্রসিদ্ধ মঠ।

শ্রীক্ষেত্রের মঠ সমুহের সহিত শ্রীমন্দিরের অনেকটা সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য তাহাদের বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য। পুরীতে ৭৫৩ মঠ আছে, সমস্ত মঠের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও বহু-পরিশ্রম ও সময়ের আবশ্যক। সুতরাং প্রধান কয়েকটী মঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থানে প্রদত্ত হইল।

## ১। শুভনারায়ণের মঠ।

এই মঠে শুভনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহা অতি প্রাচীন স্থান।
... শুভনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন।

## ২। জগন্নাথবল্লভ মঠ।

এই মঠ নরেন্দ্র সরোবরের নিকট। এই মঠের ভিতর প্রকাণ্ড-বাগান আছে। ইহা জগন্নাথের লীলাক্ষেত্র কারণ এই স্থানে অনেক উৎসব হইয়া থাকে। এই মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাদেবী এবং রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে মদনমোহন যাইয়া অনেক লীলা করিয়া পুনরায় শ্রীমন্দিরে গমন করেন।

## ৩। জটিয়াবাবার মঠ।

নরেন্দ্র সরোবরের পাড়ে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি আছে। এই দেশে ইহাকে জটিয়াবাবার মঠ বলে। আশ্রমটী বড় সুন্দর। চন্দন যাত্রার সময়ে এই মঠে ভোগ দেওয়া হয়। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১২৪৮ সালের শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দেহত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোভাবের দিনে এই স্থানে উৎসব হয়। ইনি বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহারপর কোন সিদ্ধ পুরুষের অনুগ্রহে পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে এই মহাত্মা ৺গয়াধামে উপস্থিত হইয়া কোন পাহাড়ের উপরিভাগস্থ একটী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় এক জন প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাকে এবং ঐ মন্দির দর্শন মাত্র গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্ব জন্মজ্ঞান হয়। এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। মৎপ্রণীত "অমিয়া" পুস্তকে এসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় যে এক জন উচ্চ সাধক ছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন।

## ৪। রাধাকান্ত মঠ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বারের নিকট দিয়া দক্ষিণদিকে সর্বভার

পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তায় সিংহদ্বারযুক্ত যে মঠ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে রাধাকান্ত মঠ বলে। এখানে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ আছেন, এইজন্য ইহার নাম রাধাকান্ত মঠ। এই বিগ্রহ রাজা প্রতাপরুদ্রের স্বপ্নলব্ধ বলিয়া জনপ্রবাদ আছে।

এই স্থানে পূর্ব্বে রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব কাশীমিশ্রের বাড়ী ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে আসিয়া কিছু দিন সার্ব্বভৌমের বাটীতে ছিলেন। তাহারপর রাজার আদেশে এই স্থানে বাস করিতেন। যে স্থানে তিনি থাকিতেন তাহার নাম "গম্ভীরা"। মহাপ্রভুর কন্থা, কমণ্ডলু ও পাদুকা অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান আছে।

## ৫। সার্ব্বভৌম মঠ।

শ্বেত গঙ্গার দক্ষিণ তীরে সার্ব্বভৌমের বাড়ী। বাড়ীটী প্রকাণ্ড। এই বাড়ীর একটী মন্দিরের মধ্যে রাধারমণ, রাধাবিনোদ, রাধামোহন ও সোণার গৌরাঙ্গ আছেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজ মুর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই ষড়ভুজ মূর্ত্তি একটী দেওয়ালে অঙ্কিত আছে। এই মঠকে গঙ্গামাতা মঠ ও বলে।

## ৬। নানক মঠ।

স্বর্গদ্বারে যাইবার রাস্তার দুইধারে সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। বামধারে নানক পন্থীর মঠ আছে। এই মঠের একটী মন্দিরের ভিতর পাতালগঙ্গা আছে। নানককে যবন মনে করিয়া জগন্নাথের মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, সেইজন্য তিনি এইস্থানে আসিয়া জগন্নাথদেবের ধ্যানে মগ্ন হন। ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে স্বর্ণথালে করিয়া প্রসাদ দেন ও পদদ্বারা কূপ খনন করতঃ গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করেন। ইহাকেই লুপ্ত গঙ্গা বলে। এই মঠে গোপালজি ও গুরু নানকের সেবা

হইয়া থাকে। গুরু নানক পরম সাধু ছিলেন এবং হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন।

## ৭। কবির মঠ।

নানক মঠের নিকটে কবির মঠ। এইস্থানে কবিরের সমাধিস্থান আছে। মহাত্মা কবির পরম সাধু ছিলেন। ইঁহার উপদেশ পূর্ণ দোঁহাবলী আছে। ইনি কোন ধর্ম্মই বিদ্বেষ করিতেন না।

## ৮। হরিদাস মঠ।

এইটী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠ। এই মঠে ব্রহ্ম হরিদাসের সমাধি আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব স্বহস্তে এই সমাধি দিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী মন্দির আছে তাহার মধ্যে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতানন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্টিত আছে।

## ৯। শঙ্কর বা গোবর্দ্ধন মঠ।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ২৬৩১ যুধিষ্টিরাব্দে, বৈশাখ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে, দাক্ষিণাত্যে কেরলদেশান্তর্গত কাপটী-গ্রামে শ্রীশিব গুরু নামক ব্রাহ্মণের অংশে সীতাদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। যদি এই মহাত্মার অভ্যুদয় না হইত তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শঙ্করাচার্য্য অনেকের নিকট্ শঙ্করের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

এই মহাত্মার প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন হয় এবং তাহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। এই অল্পবয়সে তাঁহার এত পাণ্ডিত্য লাভ হয় যে তিনি গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি ষোল খানি গ্রন্থের ষোলটী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তিনি বদরিকাশ্রমে যোষী বা জ্যোতির্মঠ, দ্বারকায় সারদা-

মঠ এবং মহীসুরে শৃঙ্গবৈরিমঠ স্থাপিত করেন। পরিশেষে ২৬৫৫ যুধিষ্ঠিরাব্দে রাজদত্ত সাহায্যে পুরীতে গোবর্দ্ধন, বালি বা শঙ্করমঠ স্থাপন করেন। এই সময়ে বিপ্রলাভ বা শরশঙ্খ দেব উড়িষ্যার রাজা ছিলেন।

শঙ্কর মঠ প্রথমে জগন্নাথ মন্দিরের অতিনিকটে ছিল, এবং এই মঠের স্বামিদিগের হস্তেই জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। বহুকাল পরে মারহাট্টা রাজা রঘুজীর আধিপত্য সময়ে শঙ্কর মঠ স্থানান্তরিত হইয়া স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতীরে স্থাপিত হয়। সেই মঠই বর্ত্তমান গোবর্দ্ধন মঠ। এই মঠের ভিতর প্রবেশ করিলে দুইটী মন্দির পাওয়া যায় তাহার একটীতে রাধাকৃষ্ণ এবং অপরটীতে শিবমূর্ত্তি আছেন। নিকটস্থ অন্য একটী গৃহে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের একটী মূর্ত্তি আছে। পুরীধামে যতগুলি মঠ আছে তাহার মধ্যে এইটী বহুদিনের স্থাপিত এবং প্রাচীন কীর্ত্তি প্রকাশক।

শঙ্কর মঠের "গুরু পরম্পরা" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে শ্রীস্বামী শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান স্বামী শ্রীমধুসূদন তীর্থ স্বামী পর্য্যন্ত ১৪৩ পুরুষ অতীত হইয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য শ্রীপদ্মপাদাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিতকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়া এই মঠের সেবকরূপে সর্ব্ব প্রথমে অভিষিক্ত করেন। এই পদ্মপাদাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানন্দ স্বামী পর্য্যন্ত ১৯ পুরুষ মধ্যে এই মঠের স্বামীরা 'অরণ্য' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। জ্ঞানানন্দ শিষ্য না করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করায় কিছুকাল এই মঠের অধ্যক্ষের স্থান শূন্য ছিল। অনন্তর তীর্থ নামক একজন স্বামী কাশীধাম হইতে আসিয়া এই মঠের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এই মঠের মোহন্তদের, "তীর্থ" উপাধি হইয়াছে। এই মঠের পঞ্চম পুরুষ বাম দেব স্বামী "পঞ্চদশী" গ্রন্থের রচয়িতা, একাদশ পুরুষ শ্রীধর স্বামী গীতা

"সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা" রচয়িতা ছিলেন বলিয়া "গুরু পরম্পরা" গ্রন্থে প্রকাশ। ইহার মধ্যে যে সময় কেহ অধ্যক্ষ ছিলেন না তাহাও দুই পুরুষের কম হইবে না। সুতরাং এই গোবর্দ্ধন মঠ দুই সহস্র বৎসরের অধিক স্থাপিত হইয়াছে অনুমান করা যায়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই চতুর্ম্মঠ স্থাপনের পর দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্ম বিস্তার করেন এবং বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করেন। এই উপলক্ষে বৈষ্ণব চূড়ামণি গৃহস্থাশ্রমী কাশ্মীরবাসী মণ্ডনমিশ্রের সহিত তুমুল বিচার হয় এবং অবশেষে মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হন। মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলে, তাঁহার পত্নী উভয় ভারতী রতিশাস্ত্রের প্রশ্নেতে শঙ্করাচার্য্যকে পরাজিত করেন। শঙ্করাচার্য্য উভয়ভারতীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যোগবলে তাঁহার দেহ রাখিয়া কোন এক গৃহস্থ রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করেন। তাহারপর কিছুকাল রাজদেহে থাকিয়া রতিশাস্ত্র শিক্ষার পর উক্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দেহে প্রবেশ করেন এবং উভয়ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া রতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দেন।

শঙ্করাচার্য্য "জীব ব্রহ্মৈক্যং", "তত্ত্বমসি", "সোঽহং" প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য এরূপ শিক্ষা দিয়া থাকিবেন কারণ তিনিই পরিশেষে বলিয়াছিলেন,—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং নমামকীনস্ত্বম্।
সমুদ্রোহি তরঙ্গঃ ন সমুদ্র স্তারঙ্গঃ"॥

অর্থাৎ হেনাথ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকে না তথাচ আমি তোমারই রচিত তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র সম্ভবে না।

আরম্ভ করেন সেই সময়ে তাঁহার ষোল বৎসর পূর্ণ হয়। সেই সময় বেদব্যাস উপস্থিত হইয়া তাঁহার আয়ু ষোল বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ৩২ বৎসর বয়সে জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

# পুরীধামের পবিত্রতীর্থ সমূহ।

## ১। সমুদ্র।

সমুদ্র মন্দির হইতে প্রায় একমাইল দূরে দক্ষিণে অবস্থিত। লোকে এইস্থানে শ্রাদ্ধ এবং ফলদান করিয়া থাকে। সমুদ্রস্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। সমুদ্র সাকার ব্রহ্মের স্বরূপ। একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত।

## ২। স্বর্গদ্বার।

স্বর্গদ্বার সমুদ্রের ধারে। ইহা পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ। ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে এইস্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন সেইজন্য কিম্বা এইস্থানে স্নান করিলে স্বর্গে যাওয়া যায় এজন্য স্বর্গদ্বার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। স্বর্গদ্বারের নিকটস্থ সমুদ্রজলে তর্পণাদি করিলে, তাহা স্বাক্ষী স্বরূপ জগন্নাথের নিকট বলিয়া গোপাল মূর্ত্তিকে সাক্ষী রাখিয়া যায়। স্বর্গদ্বারের নিকট হনুমান, রামজীর মন্দির, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী, মহাদেবের মন্দির এবং বিদুরের বাড়ী আছে। বিদুরমঠে ক্ষুদের পিঠা এবং শাকভোগ দেওয়া হয়। এই বিদুর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের সখা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরাতে রাজা হইয়াছিলেন, বিদুর তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে একমুষ্টি চাউল

চাউল আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই উপহারের প্রতিদানে বিদুরের অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল।

## ৩। চক্র তীর্থ।

চক্রতীর্থ অতি পবিত্র তীর্থ। এইস্থান জগন্নাথের মন্দির হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্রের নিকটে একটী কুণ্ডে জল আছে তাহাকে চক্রতীর্থ বলে। এইস্থানে জগন্নাথ নির্ম্মাণ জন্য এক দারু ভাসিয়া লাগিয়াছিল। বলরাম দাস নামক একজন ভক্ত বালুর মঠ করিয়া জগন্নাথ-দেবের আরাধনা করিয়াছিলেন সেই জন্য এখানে বালুর মন্দির গড়াইতে হয়। এখানে চক্রনারায়ণ ও হনুমান আছেন।

## ৪। শ্বেতগঙ্গা।

শ্বেতগঙ্গা একটী বিস্তৃত সরোবর। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং অত্যন্ত গভীর। চতুর্দ্দিকে পাথরের সিঁড়ি আছে এবং মধ্যস্থানে ছোট একটী মন্দির আছে। ইহার দক্ষিণতীরস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্বেত মাধব আছেন। এই সরোবরের জল স্পর্শ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

## ৫। পুরীগোস্বামীর কূপ।

পূরীগোস্বামী আপন মঠে বাস করিতেন। সেই মঠে একটী কূপ খনন করা হইয়াছিল কিন্তু জল উঠে না। মহাপ্রভু ঐস্থানে উপস্থিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপ কেমন হইয়াছে?" পূরী গোস্বামী উত্তর করিলেন, "জল উঠে নাই।" মহাপ্রভু কূপ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গাস্তব

## ৬। মার্কণ্ডেয় সরোবর।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এইস্থানে তপস্যার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষির সুবিধার জন্য এখানে একটী সরোবর করিয়াছেন, তাহারই নাম মার্কণ্ডেয় সরোবর। রাজা কুণ্ডল কেশরী ১৮২০ খৃঃ অব্দে এই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মান করিয়াছেন। মন্দিরে মার্কণ্ডেয় শিব আছেন। এই সরোবরে পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদান করিতে হয়। ইহাতে স্নান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

## ৭। নরেন্দ্র সরোবর।

নরেন্দ্র সরোবরের অপর একটী নাম চন্দন তলা। এখানে চন্দন যাত্রা হয়। সরোবরটী অতি বৃহৎ এবং দেখিতে অতিসুন্দর, চতুর্দ্দিকে পাথরের সিঁড়ি আছে। মাঝখানে ছোট একটী মন্দির আছে তাহার নাম গঙ্গাদেবীর মন্দির।

## ৮। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

এই সরোবর দীর্ঘে ৫৮৬ ফিট এবং প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ব্রাহ্মণদিগকে কোটী কোটী গাভী দান করিয়াছিলেন। সেই সকল গাভীর খুরাঘাতে মৃত্তিকা খনন হইতে হইতে এক বৃহৎ খাত নির্ম্মিত হয়। তাহার পর গাভী সকল উৎসর্গ করিবার সময় দানজলে এই খাত পূর্ণ হইয়া এক বৃহৎ সরোবরে পরিণত হয়। ইহা অতীব পবিত্র তীর্থ।

## ৯। আঠার নালা।

আঠারনালা একটী প্রকাণ্ড পুল। এই পুলের ভিতর দিয়া আঠারটী নালা আছে এইজন্য ইহাকে আঠারনালা বলে। পুরীর নিকট দিয়া যে নদী গিয়াছে তাহার সহিত সমুদ্রের যোগ ছিল, সেই জন্য পার হইবার

উপায় ছিল না। এই পুল সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তাঁহার আঠারটী পুত্র এস্থানে কাটিয়া দিয়া পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না কারণ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যখন জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সন্তানাদি কেহ জীবিত ছিল না। অপর একটী জনশ্রুতি আছে যে উক্ত নদী পার হইতে না পারায় জগন্নাথ দর্শনের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এই ঘটনায় রাজার অত্যন্ত মনোকষ্ট হয়। সেইজন্য ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই স্থানটী বাঁধাইয়া দিলেন। ইহা সম্ভব হইতে পারে।

## ১০। লোকনাথ।

লোকনাথ শ্রীমন্দির হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এইস্থানে লোকনাথ শিব বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারার্থ লঙ্কাভিমুখে গমন করিবার সময় অন্য কোন শিবলিঙ্গ না পাওয়াতে শবরদিগের প্রদত্ত লাউ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। লাউদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন এজন্য লাউক কিম্বা লোকনাথ বলে। শিবরাত্রির সময় এখানে প্রকাণ্ড মেলা হয়। এইদিন ব্যতীত শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা সমুদ্র জলে মগ্ন থাকেন। পুরীর লোকেরা ইঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে।

## ১১। গুঞ্জাবাড়ী।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্ত্রী গুণ্ডিচা রাণীর নামানুসারে গুণ্ডিচা বাড়ী কিম্বা গুঞ্জাবাড়ী নাম হইয়াছে। ইহা শ্রীমন্দির হইতে এক মাইল দূরে। এই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথের পর ৯ দিন অবস্থান করেন।

## ১২। টোটাগোপীনাথ।

ইহা জগন্নাথের মন্দির হইতে দক্ষিণদিকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সমুদ্র

তীরে অবস্থিত। টোটা গোপীনাথ নাম হইবার তিনটী কারণ আছে—টোটা অর্থ বাগান, বাগানের মধ্যে গোপীনাথ আছেন এজন্য টোটা গোপীনাথ। সমুদ্রের তটে আছেন এজন্য "তটে গোপীনাথ" অথবা টোটা গোপীনাথ। আর এক ব্যাখ্যা আছে যে মহাপ্রভু গোপীনাথের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার উরুদেশ ফাটিয়া যায়, তাহা হইতে নাম হইল টোটা গোপীনাথ। মহাপ্রভু জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোনটী সত্য তাহা বলা কঠিন।

## ১৩। যমেশ্বর শিব।

শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে দক্ষিণদিকে সমুদ্রের নিকট যমেশ্বর শিবের মন্দির আছে। ইনি যম রাজার দ্বারা স্থাপিত বলিয়া ইঁহাকে যমেশ্বর শিব বলে।

## ১৪। কপালমোচন শিব।

রুদ্রদেব ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া শঙ্খের দ্বিতীয়াবর্ত্ত স্থানে রাখিয়াছিলেন। এই অবধি সেই ব্রহ্মকপাল, কপালমোচন শিব রূপে অবস্থিত আছেন। ইঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ পর্য্যন্ত নাশ হয়। কপালমোচন শিবের মন্দিরের নিকট গণেশের ও ষড়াননের মন্দির আছে। এইস্থানে একটী কূপ আছে তাহার নাম মণিকর্ণিকা।

## ১৫। মৃত্যুঞ্জয় লিঙ্গ।

হরিরথাতের তীরে মহর্ষি মার্কণ্ড, ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই মূর্ত্তি পূজা করিয়া মৃত্যুকে জয় করতঃ অন্তিমে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে মানব মৃত্যুকে জয় করতঃ মোক্ষফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

## ১৬। অলাবুকেশ্বর।

ইহা ললাটেন্দুকেশরী কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইঁহার পূজা করিলে অপুত্রা পুত্রবতী হয়।

## ১৭। সিদ্ধবকুল।

এইস্থানে হরিদাস বাস করিতেন। তিনি এইস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'সিদ্ধবকুল'। পুরীর রাজা কোন কারণে এই বৃক্ষটী কাটিবার আদেশ করেন, কিন্তু কর্ম্মচারিগণ এই বৃক্ষটী কাটিতে আপত্তি করেন। রাজা বলিলেন, যদি ঐ বকুল গাছের কোন মাহাত্ম্য থাকে তাহা হইলে কোন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে নচেৎ আগামী কল্য এই গাছ কাটিয়া ফেলা হইবে। পরদিন দেখা গেল যে বৃক্ষটীর মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া কতকটা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এবং গাছটীর সারভাগ সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া কেবল বল্কলটী মাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক্ষটীর অবস্থা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বৃক্ষটী অদ্যাবধি সেই ভাবেই আছে।

# উপসংহার।

———:*:———

শ্রীক্ষেত্রের তুল্য পবিত্রতীর্থ ভারতের কুত্রাপি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না কারণ জীব এইস্থানে সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মোপাসনার এমন সুন্দর স্থান আর কোথায় আছে? একবার সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকুন তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে সমুদ্র ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক। আহা! সমুদ্র যেন প্রেমোন্মত্ত হইয়া অহর্নিশ সেই প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত পুরুষের মহিমা

কীর্ত্তন করিতেছেন। আবার আমাদের মত মহাপাপীকে শেষের দিনটা স্মরণ করাইয়াদিবার জন্য যেন বলিতেছেন, "আমিলোকক্ষয়কর্ত্তা উৎকট কাল।" পুনরায় প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া অভয় দিতেছেন, "জীব! ভয়কি? আমিই পিতা এবং আমিই মাতা। দেখ কত জীবজন্ত আমার ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে, আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাহাদিগকে স্তন্যদানে লালন পালন করিতেছি। তোমরা সংসারের জ্বালা যন্ত্রনায় যখন অস্থির হইয়া পড়িবে, তখন আমার ক্রোড়ে আসিও, আমি তোমাদের তাপিত অঙ্গ শীতল করিব। সমুদ্রের এই উভয় ভাব দেখিলে কি সেই বিশ্বপিতা এবং বিশ্বজননীর কথা মনে পড়েনা? সমুদ্রের প্রশান্ত ভাব দেখিলে মনে কত আনন্দ হয় এবং বাত্যাবিলোড়িত তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র দেখিলে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। এই উভয় ভাব সর্ব্বদা সেই অনন্তপুরুষকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রশান্ত স্থিরসমুদ্র নির্গুণব্রহ্মের স্বরূপ। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন ক্রমশঃ সগুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবরূপে পরিণত হন, স্থির সমুদ্র ও সেইরূপ তরঙ্গযুক্ত, ফেণরাশিযুক্ত এবং কোটী কোটী বিন্দুবারিতে পরিণত হইয়া থাকেন। তরঙ্গযুক্ত সমুদ্রকে সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে। সমুদ্রের তরঙ্গসকল শুভ্রবর্ণ ফেণরাশি মাথায় করিয়া ছুটিয়া থাকেন ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এই শুভ্রবর্ণ ফেণরাশিযুক্ত সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। সমুদ্র যে অনন্ত কোটী বিন্দুবারিতে পরিণত হইয়া তীরের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, তাহাই জীব স্বরূপ। সগুণ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে। সমুদ্রের ও এই তিন শক্তি যে আছে তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এই ভূমণ্ডল সমুদ্র হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রই জীবজন্ত এবং বৃক্ষাদিকে বারিপ্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা

থাকেন, সুতরাং সমুদ্রকে যদি আমরা ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করি তাহাতে কোন দোষ হয়না বরং ব্রহ্ম যে কি বস্তু তাহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি ইহাই বুঝিতে হইবে। এই জন্য ভগবান বলিয়াছেন, "সরসামস্মি সাগরঃ" অর্থাৎ জলাসয় সমূহের মধ্যে আমি সাগর। তাহা হইলে সমুদ্র যে ব্রহ্ম জ্ঞানের সহায়ক তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা যে সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ তাহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। ইহা কল্পনা নয়, জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি সকলস্থানে থাকিলেও তাহার দাহিকাশক্তি নাই কিন্তু সূর্য্যকান্ত মণিদ্বারা সেই সকল রশ্মি একত্র করিতে পারিলে তাহার দাহিকাশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ ভগবান সকলস্থানে বিরাজ করিলেও ভক্তের হৃদয়রূপ সূর্য্যকান্ত মণিদ্বারা তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজা পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহার ভক্তিতে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কাষ্ঠনির্ম্মিত ত্রিমূর্ত্তির অনুপরমানুতে সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুখমণ্ডলের গঠন প্রণালী তাদৃশ সুন্দর নয় কিন্তু চক্ষুদুইটী অতীব মনোহর। চক্ষুদুইটী দর্শন করিলে কি এক মহান ভাবের উদয় হয় তাহা যাঁহারা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিছুক্ষণ চক্ষুর্দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে "শশিসূর্য্যনেত্রম" এবং "একাংশেনস্থিতো জগৎ" এই ভগবদ্বাক্য দুইটী মনে উদয় হইয়া থাকে। জগন্নাথের মূর্ত্তি ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি বলিয়া অনেকেরই ধারণা। সুতরাং এই ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক।

মহাপ্রসাদও ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক কারণ ইহাদ্বারা সর্ব্ব জীবে সমভাব আনয়ন করিতেছে। মহাপ্রসাদে জাতি ভেদ নাই। সকলেই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের মুখে প্রসাদ দিয়া থাকেন। তাহা হইলে সমুদ্র, জগন্নাথ

এতক্ষণ আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহা জ্ঞানীর পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে নহে। যাঁহার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে তিনি ঐ সকল দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ প্রগাঢ় ভক্তিযোগদ্বারা অহঙ্কারের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু অনেক লোকেরই সে জ্ঞানলাভ করা দূরে থাকুক, ইচ্ছা পর্য্যন্তও হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের মুক্তি কিরূপে হইতে পারে? সাধারণ লোকের তাদৃশ জ্ঞান এবং ভক্তি না থাকুক কিন্তু তাঁহাদিগের বিশ্বাস আছে যে জগন্নাথ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, তাঁহার মত দয়ার সাগর আর নাই, তিনিই কলির প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে এবং তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিলে পুনর্জ্জন্ম হইবে না। এই বিশ্বাস যদি না থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শনের জন্য বহুলোক আসিতেন না। যাঁহার বিশ্বাস আছে, তাঁহার আবার ভাবনা কি? কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূরে। একটা গল্প মনে পড়িল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থানে লিখিতে বাধ্য হইলাম।

গঙ্গানদীর নিকটবর্ত্তী কোন একগ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গৃহে পত্নী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিল না। তিনি শাস্ত্র চর্চ্চা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে গঙ্গাস্নান করিলে নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের জন্য ব্রাহ্মণ কোন দিন গঙ্গাস্নান করিতেন না তিনি যোগের সময় ও গঙ্গাস্নান করেন না এজন্য ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দুঃখিতা। একদিন বড় একটা গঙ্গাস্নানের যোগ পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ যাহাতে যোগের সময় গঙ্গাস্নান করেন সেজন্য ব্রাহ্মণী বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেখ ব্রাহ্মণী! আমার এখন বয়স তাদৃশ অধিক হয় নাই, কার্য্য ও শেষ হয় নাই, সংসারেও এমন কেহ নাই যে আমার অভাবে সে

তখন তোমার উপায় কি হইবে? ব্রাহ্মণী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, “পণ্ডিত হইলেই কি মূর্খ হইতে হয়? তোমার মত মহামূর্খ আমি দেখি নাই। গঙ্গাস্নান করিলে যদি মুক্তি হইত তাহা হইলে এতদিন লক্ষ লক্ষ লোক চতুর্ভুজ হইয়া যাইত। এই দেখ আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম, আমি কি চতুর্ভুজ হইয়াছি? যোগ আর অধিক সময় থাকিবেনা, তুমি এখনই যাইয়া একটা ডুব দিয়া আইস।”

ব্রাহ্মণ পত্নীর কথা সেদিন আর লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার কালপূর্ণ হইয়াছে কাহার সাধ্য আমাকে রক্ষা করে। তখন তিনি অর্থাদি যেখানে যাহা ছিল ব্রাহ্মণীকে দেখাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণী হাঁসিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ গঙ্গায় একটী ডুব দিয়া নিজের দেহের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন যে তিনি চতুর্ভুজ হইয়াছেন কি না। যখন দেখিলেন যে তিনি যে দ্বিভুজ সেই দ্বিভুজই আছেন, তখন অতিদুঃখিত অন্তঃকরণে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নারদকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবর্ষি! গঙ্গাস্নানে মুক্তি হইয়া থাকে, কৈ আমার ত মুক্তি হইল না।” দেবর্ষি নারদ বলিলেন, “আমি এখনই গঙ্গাস্নান করিব কারণ যোগ আর অধিক্ষণ থাকিবে না। পশ্চাৎ ব্রহ্মা আসিতেছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।” ব্রাহ্মণ কিছুদূর গমন করিলেই হংসারোহণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে আসিতে দেখিলেন। গঙ্গাস্নানে কেন তাঁহার মুক্তি হইল না জিজ্ঞাসা করাতে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, “পশ্চাৎ শিব আসিতেছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।” আর কিছুদূর গমন করিলে ব্রাহ্মণের সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর বলিলেন, “পশ্চাৎ বিষ্ণু আসিতেছেন, তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।” আর কিছুদূর গমন করিলে ব্রাহ্মণ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এবং বনমালাসুশোভিত ভগবান বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন। বিষ্ণুকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব শেষ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন! গঙ্গাস্নানে আমার মুক্তি কেন হইল না?” তখন ভগবান ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “বৎস্য! মুক্তি কাহাকে বলে? তুমি যে আমার বৈকুণ্ঠধামে আসিয়াছ। এখানে আসাকেই মুক্তি বলে। এখন একবার নিজদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।” ব্রাহ্মণ যে বৈকুণ্ঠধামে আসিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছেন তাহা তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন।

বিশ্বাসের যে কতদূর ফল তাহা উপরিউক্ত গল্প হইতে বুঝিতে পারাযায়। যোগ, যাগ এবং তপস্যায় যে ফল বহু বিলম্বে পাওয়া যায়, সেই ফল একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা অতি সত্বর লাভ হইয়া থাকে। যে সমুদ্র পার হইতে শ্রীরামচন্দ্রের বহু সময় প্রতীক্ষা এবং বহুকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই সমুদ্র হনুমান একমাত্র বিশ্বাস বলে অতি সত্বর পার হইয়াছিলেন। নামে বিশ্বাস ছিল বলিয়া প্রহ্লাদ জলে শীলা ভাসাইয়াছিলেন এবং সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। প্রহ্লাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হরি আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল স্থানে বিরাজ করিতেছেন এবং সেই বিশ্বাসের জন্য ভগবান স্ফটিকস্তম্ভ বিদারণ করিয়া নরসিংহমুর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা বিশ্বাসের জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি আছে? যাঁহার বিশ্বাস আছে যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে এবং তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না, তাঁহার ভাবনা কি? তাঁহার মুক্তি অনিবার্য্য।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যাহার বিশ্বাস নাই তাহার জগ-

ন্নাথ দর্শনে মুক্তি হইবে কি না ? যদি শাস্ত্র সত্য হয় তাহা হইলে জ্ঞান, ভক্তি এবং বিশ্বাসবিহীন লোকেরও জগন্নাথ দর্শনে মুক্তি হইবে।

স্কন্দপুরাণেঃ—

"দক্ষিণোদধিতীরস্থং দারুব্রহ্ম সনাতনং।
বিনাসাংখ্যং বিনাযোগং দর্শনাৎ মুক্তিদং ধ্রুবং।"

অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ হীন ব্যক্তি ও দক্ষিণ সমুদ্র তীরস্থ সনাতন দারুব্রহ্ম দর্শন করিলে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবেন।

সূর্য্যের স্বভাব যেমন তাপ দেওয়া, চন্দ্রের স্বভাব যেমন শীতলতা প্রদান করা সেইরূপ এই দারুব্রহ্মের স্বভাব মোক্ষ প্রদান করা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে জ্ঞানী, ভক্ত এবং বিশ্বাসবিহীন শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তি সকলেই জগন্নাথ দর্শনে কি সমান ফল পাইবেন ? এই প্রশ্নের উত্তরের ভার সহৃদয় পাঠক বর্গের উপর অর্পিত হইল। তবে আমাদের বিবেচনায় কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, কি ভক্ত কি অভক্ত, যে কেহ জগন্নাথ দর্শন করিবেন তাঁহার আর গর্ভযন্ত্রণা পাইতে হইবে না। যিনি জ্ঞানী কিম্বা ভক্ত তিনি দেহান্তে ভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন এবং অজ্ঞানী কিম্বা অভক্ত দেহান্তে কোন উচ্চ লোকে গমন কয়িয়া ভগবৎ আরাধনাদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন।

নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু, ভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব, গ্রন্থের মধ্যে যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তীর্থের মধ্যে তেমনি শ্রীক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ, কারণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান জীব উদ্ধারের জন্য দারুব্রহ্ম রূপে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, কি ভক্ত কি অভক্ত, কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী সকলেরই এই পবিত্র তীর্থ দর্শন করা কর্ত্তব্য। যিনি সমস্ত সৃষ্টিপদার্থে সদ্রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁহা হইতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে, যিনি লীলারূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং

যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং যিনি জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য দারুব্রহ্মরূপে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আমরা ধ্যান করি। আর যিনি পরিবার, প্রজাবর্গ এবং বিষয়সম্পত্তি পরিত্যাগ করতঃ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক শতাশ্বমেধ যজ্ঞেরদ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং যাঁহার অনুগ্রহে মনুষ্য, পশু, পক্ষী. কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলপ্রকার জীব অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতেছেন, সেই পরম কারুণিক বিষ্ণুভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে প্রণাম করি। বিদায়কালে পাঠকবর্গের নিকট সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে আপনারা এই অধমের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া একবার "জয় জগন্নাথ" বলুন।

## সমাপ্ত।